দ্বিতীয় অধ্যায় :- তেহট্ট মহকুমা: ইতিহাস-ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষিক অবস্থান।

তেহট্ট মহকুমা: ইতিহাস-ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষিক অবস্থান

নদীয়া জেলা ও তেহট্ট মহকুমা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন জেলা নদীয়া, এই জেলার চারটি মহকুমার অন্যতম তেহট্ট মহকুমা, তেহট্ট মহকুমা নদীয়া জেলার সর্বকনিষ্ঠ মহকুমা। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো নদীয়া জেলার প্রাচীন রূপের অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমান নদীয়ার সাথে প্রাচীন কালের নদীয়ার ভৌগোলিক, অবস্থান, চতুঃসীমার মিল বিশেষ নেই। প্রাচীন কালের লেখকরা এই অঞ্চলে গৌড় ও বঙ্গ নামে দুটি রাজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন,[১] গৌড় রাজ্যটি গঠিত ছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, মৌলপত্তন যা বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত ও কণ্টক পত্তন যা বর্তমানে বর্ধমান জেলাস্থিত প্রভৃতি অঞ্চলকে নিয়ে। অর্থাৎ নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গৌড় রাজ্যটি গঠিত ছিল। পরবর্তীকালে বঙ্গ ও ভুবনেশ রাজ্যের মধ্যবর্তী অংশতে গৌড় রাজ্যের অবস্থান ছিল।

মহাকবি কালিদাস বঙ্গকে গঙ্গার প্রবাহের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘রঘুবংশ’ কাব্যে। পাল-সেন আমলের তথ্য অনুযায়ী বঙ্গকে ‘রঘুবংশ’-এ বর্ণিত অঞ্চল অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২] যশোহর বা তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের বদ্বীপের কিছু অংশও উপবঙ্গ নামে খ্যাত ছিল। গাঙ্গেঁয় বদ্বীপের পূর্বাংশই প্রকৃত বঙ্গ রূপে চিহ্নিত। নদনদী ও খাড়িতে পরিপূর্ণ গাঙ্গেয় বদ্বীপের দক্ষিণ পূর্বাংশ ছিল নাব্য। এই অংশ দিয়ে জাহাজ চলাচল করত। ষষ্ঠ শতকে রচিত ‘বৃহৎসংহিতা’-র বর্ণনা থেকেও আমরা জানতে পারি উপবঙ্গ নামে লিখিত অঞ্চল গাঙ্গেয় বদ্বীপের কিছু কিছু অংশ ছিল, ই্খতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন্ বখ্তিয়ার খলজীর ‘নওদীয়া’ বা ‘নোদীয়া’ অভিযানের পূর্ব পর্যন্ত নদীয়া অঞ্চল বঙ্গ এবং গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে করা হয়। নয়টি দীয়া বা দ্বীপ নিয়ে গঠিত বলে নদীয়া নামকরণ করা হয়েছে। এই নিয়ে অবশ্য কিছু বিতর্ক আছে। আমরা কোনোরকম বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলতে পারি নদীয়া জেলা পূর্ববর্তীকালে দ্বীপাঞ্চল ছিল।

নদীয়ার জন্মকথা ঃ

নদীয়ার জন্মকথা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই মনে আসে নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীচৈতন্য বা মহাপ্রভুর কথা। যার পুতস্পর্শে ও সাহচর্যে সনাতন হিন্দু ধর্ম ও বৈষ্ণবধর্ম সারা ভারতবর্ষে প্রচারিত হয় ও বঙ্গদেশ পরিচিতি লাভ করে। তার জন্মস্থান নবদ্বীপ হয়ে ওঠে পুণ্যস্থান। প্রাচীন বঙ্গদেশের রাজধানীর নাম ছিল নবদ্বীপ যা বর্তমানে নদীয়া হয়েছে। আরও বলতে গেলে বলা যায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের পীঠস্থান ছিল নবদ্বীপ যা আজ বিকাশের ধারায় পিছিয়ে পড়েছে। একইভাবে নদীয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জ্ঞান, শিক্ষা ধর্মের ক্ষেত্রে এই প্রদেশকেও বেশ ঐশ্বর্যময় বলে পরিচয় পেয়ে থাকি। তাই অনেকের মতে নদীয়া ও নবদ্বীপ একই জায়গার ভিন্ন নাম। এ নাম নিয়ে অনেক মত ও মতানৈক্য রয়েছে। তবে শতবর্ষ পূর্বে টুইনিং[৩] নামক এক ভ্রমণকারী নদীয়াকে বহু প্রাচীন নগর বলে স্থির করেন এবং খৃষ্টজন্মের সার্ধদ্বিসহস্রবর্ষ

পূর্বে এই নগরের অস্তিত্ব ছিল বলে তিনি প্রমাণ পেয়েছেন।

নবদ্বীপের প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেকেই বহুমত প্রকাশ করেছেন। তবে একথা সত্য, নদী সতত চঞ্চলা তাই বলা চলে ভাগিরথী ও জলঙ্গী নদী বেষ্টিত নবদ্বীপ নগর বহুবার নদীর খেয়ালে জলমগ্ন হয়েছে এবং নতুন বসতি পুনরায় স্থাপিত হয়েছে। কথিত আছে যে হিন্দুকুল চূড়ামণি মহারাজ আদি শূর ৯৯৯ শকে বা ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধদের অধিকার থেকে বঙ্গভূমিকে উদ্ধার করেন[৪] কিছুদিন এই রাজার বংশ রাজত্ব করলেও পালবংশীয়রা গৌড় অধিকার করেন। পরে সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে সেন নরপতিগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। অনেকের মতে বর্তমান নবদ্বীপের ৪ মাইল দূরে যে সুবর্ণবিহার নামে গ্রাম ছিল তা হল পালরাজাদের বাসভূমি। বিহার অর্থ মঠ, তাই এই ধারণা। তাই বলাই যায় নবদ্বীপ নগর ওই রাজাদের রাজত্বকালের শেষভাগে বর্তমান ছিল। এছাড়াও সুবিখ্যাত সেনবংশীয় রাজাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে রাজা বল্লাল সেনের প্রসঙ্গ উঠে আসে। তিনি বীর ও জ্ঞানী ছিলেন। কথিত আছে তিনি গৌড়কে প্রাধান্য না দিয়ে নবদ্বীপ ও সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক কোন উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারলেও তা যে একেবারে ভিত্তিহীন তা বলা যাবে না। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে রাজা লিওর মৃত্যু হইলে লক্ষণের পুত্র লাক্ষানয় বাংলার সিংহাসন আরোহণ করেন। সেই সময় নদীয়া বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। এছাড়া রাজা বল্লাল সেনের ভগ্ন রাজপ্রাসাদ বল্লালের স্তূপ নামে আজও বামনপুকুরে রয়েছে। এছাড়া শ্রীচেতন্য মহাপ্রভুর সময়ে গঙ্গানদীর পূর্ব ও পশ্চিমে দুটি জনপদ নদীয়া ও ফুলিয়া নামক গ্রামের নাম পাওয়া যায়। চৈতন্য ভাগবতে এর উল্লেখ রয়েছে। তাই এসব বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি নবদ্বীপ বহুবার নদী আশ্রয় করলেও সেনবংশীয় রাজা বল্লালের স্তূপ ও মহাপ্রভুর সময়ে যে কাজী কীর্তন বিরোধী হয়েছিল তার সমাধি রয়েছে আজও। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে কাজীর বাড়ির কাছে নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ী ছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থ অনুসারে নীলাম্বর চক্রবর্তীর বাড়ি বেলপুকুর গ্রামে ছিল। তা বর্তমানে বামনপুকুর গ্রাম এবং কাজীর সমাধি আজও বর্তমান। বলা যায় প্রাচীন কালের কাজীর সমাধিস্থল ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর সেনদের রাজধানী যে স্থলে ছিল তাই যে নবদ্বীপ নগর ও বর্তমানে নদীয়া এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এছাড়াও কথিত আছে যে, ১২০৩ খ্রীঃ দিল্লীশ্বর সাহাবুদ্ধিন তার সেনাপতি কুতুবউদ্দিন ও মহঞ্ম বক্তিয়ার খিলজি নামক বীরকে বাংলা জয় করতে প্রেরণ করেন। বৃদ্ধ রাজা লক্ষণ সেনের দুর্বলতার সুযোগে বক্তিয়ার খিলজি নবদ্বীপ দখল করে রাজপুরী লুণ্ঠন করে, রাজা লক্ষণ সেন নদীপথে রাজ্য থেকে পলায়ণ করেন বলে উল্লিখিত আছে। তখন বক্তিয়ার খিলজি পুরাতন রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করে লক্ষণাবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন।

তবে ভাগিরথী ও জলঙ্গী বেষ্টিত এই ভূভাগের নাম প্রথমে কি ছিল তা সঠিক বলা যায় না। এই নবদ্বীপ ও নদীয়া নামের আবার নানা অর্থ প্রচলিত আছে। যেমন সুবিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থরচনাকার নরহরি চক্রবর্তী তাঁর রচিত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা পদ্ধতি' গ্রন্থে নবদ্বীপকে 'নয়টি দ্বীপের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। গঙ্গার পূর্বপারে চার ও পশ্চিমপারে পাঁচটি গ্রাম নিয়ে তা বর্তমান। ওই নয়টি গ্রাম হল—

পূর্ব— ১) অর্ন্তদ্বীপ ২) সীমান্ত দ্বীপ ৩) গোদ্রুম দ্বীপ ৪) মধ্যদ্বীপ

পশ্চিম—১) কোলদ্বীপ ২) ঋতুদ্বীপ ৩) মোদদ্রুম দ্বীপ ৪) জহ্নুদ্বীপ ৫) রুদ্রদ্বীপ।

আবার অনেকে নব অর্থে নতুন, দ্বীপ অর্থে স্থল মানে নতুন দ্বীপ বলে থাকেন নবদ্বীপকে। গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে কালের গতিতে চরভূমি তৈরি হয়ে তা ক্রমান্বয়ে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে ও পরবর্তীতে ওই নতুন ভূমি বঙ্গের রাজধানী নবদ্বীপে পরিণত হয়। এছাড়া জনশ্রুতি আছে যে এক সাধক গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর দুই চরে প্রতি রাতে নয়টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সাধনা করতেন। দূর থেকে লোকে চরের নয়টি প্রদীপের শিখাদেখে ওই চরের নাম দেন নদীয়া। ন অর্থে নয়টি ও দীয়া অর্থে প্রদীপ। পরে ওই ক্ষুদ্র চর বিশাল আকার ধারণ করে ও বঙ্গদেশে রাজধানীতে পরিণত হয়, জনাকীর্ণ রূপ নেয়।

তাই বলা যায় জলবেষ্টিত স্থলভাগ ও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসক শাসন করায় নদীয়া বা নবদ্বীপ নাম বারবার একে অপরের সাথে এবং আকারে পরিণত হয়েছে। তাই বল্লাল সেনের আমলের নদীয়া পরবর্তীতে মানে বর্তমানে উত্তরে রাজশাহী পূর্বে পাবনা ও যশোহর, দক্ষিণে চব্বিশ পরগনা ও পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ নিয়ে বৃহৎ ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে।

নদীয়ার বিভিন্ন রাজত্ব ঃ

খ্রিষ্ঠপূর্ব চতুর্থ শতকে গাঙ্গেয় বদ্বীপে ৩৪টি রাজ্য ছিল আর এইসব রাজ্য অত্যন্ত পরাক্রমী ছিল। গ্রীক সূত্রানুযায়ী বীর আলেকজান্ডারকে ভীত করেছিল এই অঞ্চলের শাসকরা। এখানকার একটি রাজ্য গঙ্গারিড়ি। এই গঙ্গারিডি রাজ্য ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২,০০,০০০ পদাতিক ২০০ চতুরশ্ববাহিত যুদ্ধরথ ও ৩০০০ হস্তি-বাহিনীর সেনা সমাবেশে সক্ষম ছিল[৫]। গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পূর্বে পর্যন্ত বঙ্গ রাজ্যটির কোন ইতিহাস ভারতীয় সূত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রিস ও রোমান সূত্রে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত গঙ্গারিড়ি শক্তিশালী রাজ্য বলে বর্ণিত আছে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইতিহাস পরিবর্তিত হতে শুরু করে। অভিলেখ সূত্রে প্রথম স্পষ্ট উল্লেখিত হয় যে, বহিরাগতেরা বঙ্গবিজয় করেছিল। বর্তমান বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত চারটি তান্ত্রশাসনে এবং আর একটি বর্ধমান জেলায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে তিনজন স্বাধীন একছত্র অধীশ্বর গোপালচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেবের উল্লেখ আছে। বৈশ্যগুপ্ত ও গোপালচন্দ্র প্রমুখ রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরস্পরের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। পালদের রাজ্য শাসনের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত ১৫০ বছরের বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। মগধের গুপ্তরাজ্যের অবস্থিতিকালে সমস্ত গৌড়ের পরাক্রান্ত শাসনকর্তারূপে আবির্ভূত হন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তাঁর রাজধানী কর্ণসুবর্ণে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্মন আবির্ভূত হন। কর্ণসুবর্ণ রাজ্যটি নদীয়া, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, ও বীরভূমের কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এর পরবর্তীতে দেশের বিশিষ্টজনেরা দেশের অরাজকতা বা মাৎস্যন্যায় অবস্থার অবসানের জন্য গোপালকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। এরপরে গোপালের পুত্র ধর্মপাল সিংহাসন লাভ করেন। ধর্মপালের সময় রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। এই সময়ে ধর্মপাল এক ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। ধর্মপাল অস্ত্রবলে ও কুট কৌশলের সাহায্যে উত্তর ভারতের অধীশ্বর রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। উল্লেখ্য ৪০ (চল্লিশ) বছরের রাজত্বকালে ধর্মপাল বঙ্গোপসাগর থেকে সাখীর পর্যন্ত ও হিমালয়

থেকে বিন্ধ্যা পর্বত পর্যন্ত এবং পূর্বে কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। নদীয়ার দুই প্রত্নস্থল কালিগঞ্জের দেবগ্রাম ও রানাঘাটের দেবগ্রাম দেবপালের স্মৃতি বিজড়িত বলে জনশ্রুতি।

দেবপালের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী যথাক্রমে শূরপাল, বিগ্রহপাল সিংহাসন গ্রহণ করলেও এই দুর্বলচেতারা গুর্জর প্রতিহারদের আক্রমণে টিকে থাকতে পারেনি। এরপরে রাজেন্দ্রচোল মহীপালের সময় আক্রমণ করেন। কিন্তু এই যুদ্ধের পরিণতি কি হয়েছিল তার চিত্র স্পষ্ট নয়। পরবর্তীকালে গোবিন্দপালের সময় পাল রাজ্যের পতন হয় ও সেন বংশ রাজত্ব স্থাপন করেন। সেন বংশ ক্রমান্বয়ে বাংলার রাজত্ব করতে থাকেন। এই সেন বংশের রাজত্বকালের সময় বাংলায় কৌলীণ্য প্রথা প্রচলিত হয়। লক্ষণ সেনের আমলে ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খলজীর নদীয়া অভিযান ঘটে ও সেন বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে। এর পরেই বাংলাতে মুসলিম শাসনের সূচনা হয়। উল্লেখ্য এর পূর্বে নদীয়া তথা বাংলাতে মুসলিম শাসন প্রচলিত হয়নি। সুলতানি আমলে নদীয়া বাংলার সুলতানদের রাজ্যশাসনভুক্ত ছিল। পূর্ববঙ্গের রাজা অরিরাজ দনুজমাধব দশরথ দেবের আমলে নদীয়ার দক্ষিণাংশ তাঁর অধিকার ভুক্ত ছিল। মনে করা হয় তৎকালীন সমগ্র নদীয়া অঞ্চল মুসলিম বিজেতাদের দখলে ছিল না। যোড়শ শতকের পরবর্তী দুটি মুসলিম লেখমালা যার একটি চাকদহের অপরটি শান্তিপুরে পাওয়া যায়। ফখরুদ্দিন মুরারক শাহ সুলতানের আমলে সমগ্র বাংলা তাঁর অধিকৃত ছিল এবং সমগ্র নদীয়াও এই সময়কাল থেকে ইলিয়াসশাহ সুলতানি শাসনামলে ছিল।

বর্তমানে নদীয়া বলে যে সমতল পরিচিত এইখানে কালের অমোঘ টানে বিভিন্ন রাজবংশ রাজত্ব করে গেছে। যে পঞ্চগ্রাম নিয়ে গৌড় রাজ্য সীমাবদ্ধ ছিল তা পাল ও সেন বংশীয়দের করায়ত্ত হওয়ার পর বক্তিয়ার খিলজীর হাতে চলে যায় ১১৯৮খ্রিস্টাব্দে। তারপর থেকে চলে মুসলমান শাসন। বক্তিয়ার খিলজীর পর দিল্লীশ্বর গিয়াসউদ্দীনের হাতে চলে যায় বঙ্গদেশ। এরপর ১৩৮৬ খ্রিষ্ট্র সামসুদ্দিন ইলিয়াস বঙ্গদেশ অধিকার করে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থাপন করেন পরবর্তীতে ১৪৯৭ খ্রিষ্টমজাখরের প্রধান মন্ত্রী হুসেন শাহ নিজ সুবুদ্ধিবলে বাংলার শাসকে পরিণত হন। এই শাসকের সময়ে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীচৈতন্যদেব। এই সময়ের পরবর্তীতে মানে হুসেন শাহের পরবর্তীতে শেরশাহ প্রথমে বঙ্গদেশ ও পরে দিল্লীর মোঘল সম্রাট হুমায়ুনকে ১৫৪০ খ্রিষ্ট্র পরাজিত করেন। শেরশাহের মৃত্যুর পর আকবর দিল্লির সম্রাট হলে বাংলায় পাঠানদের ধূলিস্যাৎ করতে তার দক্ষ সেনাবাহিনী সহ সেনাপতি তোডরমল্লকে পাঠান ১৫৭৫ খ্রিষ্ট্র। তোডরমল্ল তদানীন্তন নদীয়ার রাজা কাশীনাথ রায়ের সহায়তায় দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করেন এবং বাংলায় পরোক্ষভাবে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুঘলরা প্রাধান্য লাভ করলে বিক্রমাদিত্য নামে এক পাঠান রাজা লুক্কায়িত থেকে ক্রমশ বলশালী হয়ে ওঠে। এরই বংশধর পরবর্তীতে প্রতাপাদিত্য নামে মুঘলদের সঙ্গে লড়াইএ ব্যাপৃত হন। কথিত আছে মুঘল সেনাপতি নদীয়া রাজ ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপকে পরাজিত ও বন্দীকরে দিল্লীতে প্রেরণ করলে পথ মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

পঞ্চদশ শতকের শেষে নদীয়ার নবদ্বীপে প্রেমের মূর্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হন। জয়নন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ও বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' থেকে সুলতানি আমলের দমন পীড়নের কথা আমরা জানতে পারি। সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ছিলেন চৈতন্যদেবের সময়ে, যিনি সর্ব ধর্মমতের প্রতি সহনশীল ছিলেন। তাঁর পুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরৎ শাহ

সুলতান হন।

দিল্লীতে মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর মানসিংহ বাংলাতে আসেন মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। দিল্লীর মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে নদীয়ার আন্দুলিয়া রাজ কাশীনাথ রায় ধৃত ও নিহত হলে তাঁর বিধবা গর্ভবতী স্ত্রী নদীয়ার বাগোয়ান (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) এর জমিদার নিঃসন্তান হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রিতা হন। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের বাড়িতে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। এই হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার তার পুত্রের নাম রাখেন রামচন্দ্র সমাদ্দার আর তাকেই বঙ্গীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেন। এই রামচন্দ্র সমাদ্দারের প্রথম পুত্র ভবানন্দ নদীয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভবানন্দ ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর প্রদত্ত ১৪ পরগনার ফরমান সূত্রে নদীয়া রাজা হন ও নদীয়া রাজবংশের সূচনা করেন। পর বর্তীতে ভবানন্দ মজুমদার রায় উপাধি ধারণ করেন।

ভবানন্দ নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাটিয়ারিতে রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তীতে রুদ্র রায় নবদ্বীপ শান্তিপুর জনপদের নিকটবর্ত্তী স্থান রেউট গ্রামে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এই স্থানের নাম পরবর্তী সময়ে কৃষ্ণের নামানুসারে কৃষ্ণনগর করা হয়। ১৮৭০-৯০ খ্রিষ্টাব্দে নদীয়া রাজ এসটেট কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীন ছিল। ১৯২৮-৯৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ার মহারাজকুমার ছিলেন সৌরিশচন্দ্র রায়।

মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পর বাংলার শাসন কর্তা জাফর খাঁ মুর্শিদকুলি খান নামে বাংলার স্বাধীন নবাব হন এবং তৎসময়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন তা আমরা ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য থেকে জানতে পারি। নদীয়ার রাজা তখন বাংলার নবাবকেই বার্ষিক কর দিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এর ফলে নদীয়ার রাজাকে কোম্পানীকে কর দিতে হয়। পরবর্তীকালে হেষ্টিংস জেলা প্রশাসন ও কর আদায়ের জন্য জেলায় সমাহর্তা নিযুক্ত করেন। এদের মাধ্যমে জেলার কর আদায় করা হত।

যারা মুসলমান শাসকদের অত্যাচারে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন তাদের মধ্যে দেবপাল অন্যতম। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কথোপকথনের মাধ্যমে নবদ্বীপ রাজবংশে বা নদীয়ার রাজা ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরের উল্লেখ পাই যেখানে দেবপালের রাজ্যপাট রাজা রাঘবের প্রাপ্যের কথা বলা হয়। কথিত আছে এক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রাপ্ত পরশপাথর দেবপাল নামক এক কুম্ভকার প্রাপ্ত হয়। তারই অদ্ভূত ক্ষমতাবলে ক্রমে দেবগ্রাম স্থাপিত হয়। এবং হিন্দু এই রাজা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর হন। তখন দিল্লির সম্রাটের কাছে ভুল তথ্য প্রেরণ করেন বিলাসে মগ্ন মুসলমান শাসকগণ। পরে অবশ্য দিল্লীশ্বর বহু সম্মান প্রদানে দেবপালকে সম্মানিত করলেও বঙ্গেশ্বরের কুচক্রে দেবপাল নিহত হন। এর পরবর্তী সময়ে ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরেরা রাজত্ব করতে থাকে একে একে। প্রত্যক্ষভাবে মুসলমান শাসন আর থাকে না নদীয়াতে। ভবানন্দের মধ্যমপুত্র গোপালের পুত্র রাঘব রেউই এ রাজধানী স্থাপন করেন। এই রেউই নাম পরিবর্তন করে কৃষ্ণনগর নাম করেন রাঘবের পুত্র রুদ্র রায়।

১৬৮২ খ্রিষ্ট জব চার্ণক নামে এক সাহেব সুতানুটি যা বর্তমান কলিকাতায় কুঠি স্থাপন করে। সুবিখ্যাত শায়েস্তা খাঁ এই সময় বাংলার নবাব ছিলেন। এই সময় নদীয়াধিপতি ছিলেন রামকৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ মুসলমান শাসনকর্তা ও ইউরোপীয়

শাসক উভয়ের প্রিয় ছিলেন। বাদশাহ রামকৃষ্ণকে ভালোবাসতেন তা দেওয়ান জাফর খাঁর মনমত ছিল না। তাই যখন তিনি মুরশিদকুলি খাঁ নাম গ্রহণ করেন ও বাংলার শাসকে পরিণত হন তখন রামকৃষ্ণকে বন্দী করেন। কারাবাসেই রামকৃষ্ণ মৃত্যু বরণ করলে মুরশিদকুলি খাঁর প্রতি নির্দেশ করা হয় সাহজাদা আজিম সারা যে রামকৃষ্ণের বংশধরকে সিংহাসন দিতে কিন্তু তার কোনো বংশধর না থাকায় নদীয়ার সিংহাসনে বসেন তার ভ্রাতা রাজজীবন। পরবর্তীতে রাজজীবনের পুত্র রঘুরাম ও তার পুত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসন লাভ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদীয়ার উন্নতি সাধন ঘটে। এই সময় নদীয়া রাজ্য উত্তরে মুর্শিদাবাদ দক্ষিণে সুদূর বঙ্গোপসাগর এবং পূর্বে ধুলিয়াপুর থেকে পশ্চিমে ভাগিরথী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[৬]

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বাংলার আকাশে দূর্যোগ ঘনিয়ে আসে। ১৭২৫ খ্রিঃ মুর্শিদকুলীর মৃত্যুর পর জামাই সুজাউদ্দিন বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার প্রাপ্ত হন। তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্যচালনা করলেও তার পুত্র সফররাজ ছিলেন উৎশৃঙ্খল। তার উৎশৃঙ্খলতা এতদূর ছিল যে সে সময়ের অন্যতম পারিষদ ফতেচাঁদ—যিনি বাদশাহ কর্তৃক জগৎশেঠ উপাধি প্রাপ্ত হন[৭] তার পুত্রবধূর উপর নজর দেন তাকে একরাত্রিতে নিজের প্রাসাদে এনে দর্শন পিপাসা মিটিয়ে পুনরায় ফেরত পাঠান[৮]। তবে কেহ কেহ মনে করেন আর্থিক ব্যাপারে বিবাদের কারণে জগৎ শেঠ, আলসচাঁদ (রাই রাইয়া) সফররাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমতাবস্থায় আলীবর্দী খাঁ বাংলার সুবেদারীত্ব লাভ করেন। প্রথমে কেহ মেনে না নিলেও পরে মেনে নেন। এই সময় নাগপুর থেকে মারহাট্টারা এসে বারবার বাংলাদেশে লুঠ চালাতে থাকে। এই ঘটনার নাম বর্গীর হাঙ্গামা।[৯] মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই সময় পৈতৃক ঋণ দশলক্ষ টাকা অনাদায়ে কারারুদ্ধ হয় নবাব আলীবর্দীর দ্বারা। পরে অবশ্য আলিবর্দী তার দুরাবস্থা দেখে মুক্তি দেন। দশ বৎসর ধরে বর্গী আক্রমণ চলায় তা থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পেরে আলিবর্দী ১৭৫২ সালে সন্ধি স্থাপন করেন। বর্গীরা সম্পূর্ণ উড়িষ্যা ও বাংলার চৌথ বাবদ দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা লাভ করে এদেশ ত্যাগ করে। বৃদ্ধ আলীবর্দী পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৭৫৬ খ্রিঃ আলীবর্দীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদে বসেন তারই দৌহিত্র সিরাজ। অল্প বয়সে রাজকর্ম হাতে পেয়ে ও বয়সের দোষে অল্পদিনেই তিনি রাজকর্মচারীদের বিরূপ মনোভাবের স্বীকার হন। তাছাড়াও ঢাকার শাসনকর্তা রাজবল্লভের পরিবার আশ্রয় দেওয়ার কারণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথেও মনোমালিন্য শুরু হয়। এমতাবস্থায় জগৎশেঠ কৃষ্ণনগরাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে নবাবকে পদচ্যুত করার জন্য তাদের সাথে যোগদানের জন্য পত্রপ্রেরণ করেন। পত্রপাঠ কৃষ্ণচন্দ্র যোগাযোগ করেন ও ব্রিটিশ রাজের কাছে সাহায্য প্রার্থনার পরামর্শ দান করেন। তাই সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত হয়, যার পরিণাম পলাশীর যুদ্ধ। মীরজাফরের আশ্বাসে আশ্বাসিত হয়ে মাত্র তিন সহস্র সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর অধিকাংশই নদীয়া থেকে সংগৃহিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ২২জুন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় সমগ্র ব্রিটিশ বাহিনী পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং গভীর নিশীথে ভাগিরথী তীরস্থ বিশাল আম্রকুঞ্জে আশ্রয়নিয়ে সে রাত্রি অতিবাহিত করে।[১০] মীরজাফর, জগৎশেঠ রায়চাঁদরা যোগ দিলেন ব্রিটিশ পক্ষে, তার যুদ্ধে মুখ ফেরালেন, একাকী মোহনলাল ও মীরমদন লড়াই করে শেষরক্ষা করতে পারলেন না। ২৩ শে জুন ঘটল বাংলায় পরোক্ষ ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত।

পলাশীর প্রান্তরে সিরাজবাহিনী পরাস্ত হল আর তারপর মীরজাফর পুত্র মীরণ এর তত্ত্বধানে জাফরগঞ্জে ৩ জুলাই ঘটল সীরাজহত্যা।

এই সময় নদিয়ার ভাগ্যাকাশে ঘটে দুর্যোগের ঘনঘটা। মীরজাফর নবাব হওয়ার পর মীরকাশেম নবাব হয়ে স্বাধীন নবাবি শুরু করে। যারা ইংরেজের পক্ষপাতী তাদের বন্দী করে। কলত্র সপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র বন্দী হয়ে পরে মুক্তি পান। এই সময় নদীয়ায় ডাকাতি, রাহাজানি শুরু হয়। ক্রমশ ১৭৬৫ খ্রিষ্ট বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি চলে যায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে। শুরু হয় ইংরেজ রাজত্ব। এরই মাঝে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর তার বংশধর রাজা গিরিশচন্দ্র রাজ্যপাট লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে নদিয়ায় বিস্তৃতি এই সময় কমে ৫/৭ টি গ্রাম ও পরগনায় পরিণত হয়। ব্রিটিশ কোম্পানি নবলব্ধ রাজ্যের রাজস্ব ও তৎসংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করে বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন সুশাসনের জন্য। ১৭৮৭ খ্রিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহের জন্য কালেক্টার পদ সৃষ্টি করে জেলা স্থাপন করা হয় নদীয়াতে। ১৮৫৭ তে সিপাহি বিদ্রোহ দমন করেন লর্ড ক্যানিং কিন্তু নীলকরদের অত্যাচারে তিনি ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। যাইহোক ১৮৫৬ খ্রিষ্ট'ইন্ডিগো কমিশন' নামে নীলকরদের অত্যাচারের সত্যাসত্য নির্ধারণের নিমিত্ত এক কমিশন নিযুক্ত করেন।[৬] এবিষয়ে প্রথম অধিবেশন ১৮ই মে কৃষ্ণনগরে বসে। যাতে নীলকরেরা প্রজাদের উৎপীড়ন করতে না পারেন তার জন্য সমগ্র নদীয়া ডিভিসনকে—যাহা এখন প্রেসিডেন্সি ডিভিশন নামে খ্যাত— কয়েকটি সাবডিভিসনে বিভক্ত করে এক একজন ডেপুটির অধীন করেন। পূর্ব থেকে নদীয়ার করিমপুর, শাওনপুর ও দামুরহন্দা তে সাব ডিভিশনের মত ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল। ১৮৬০ খ্রিষ্ট মহামতি গ্রান্ট নদীয়ার বিভাগকে ১৮ সাবডিভিসনে ও মহকুমায় ভাগ করেন।[১১]

১) কুষ্ঠিয়া, ২) মেহেরপুর, ২) ঝিনেদহ, ৪) চুয়াডাঙ্গা, ৫) কৃষ্ণনগর সদর, ৬) মাগুরা, ৭) কোট চাঁদপুর, ৮) নড়াইল, ৯)যশোহর, ১০) বনগ্রাম, ১১) শান্তিপুর, ১২) খুলনা, ১৩) সাতক্ষীরা, ১৪) বসিরহাট, ১৫) বারাসাত, ১৬) আলিপুর, ১৭) পোর্ট মাতলা (বারুইপুর), ১৮) ডায়মন্ডহারবার।

এদের মধ্যে কুষ্ঠিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, শান্তিপুর ও বনগ্রাম নিয়ে ক্ষুদ্রাকারেনদিয়া জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসনকালের থেকে নদিয়া আকৃতি এই সময় কমে যায়।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে নদীয়ার এপারের অংশ যা ভারতের অর্ন্তভুক্ত নবদ্বীপ জেলা নামে খ্যাত হয় ও পাকিস্থানের যে অংশ পরে তা নদিয়া নামে খ্যাত হয়। এর বহু পরে যখন পাক অধিকৃত বাংলার নাম পরিবর্তন করে কুষ্ঠিয়া দেয় তখন থেকে এদেশের জেলা হিসাবে নবদ্বীপের নাম পরিবর্তন করে নদীয়া হয় এবং ইংরেজ শাসন অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীন দেশ হিসাবে পরিণতি লাভ করল।

নদীয়ার শিক্ষা সংস্কৃতি ঃ

নদীয়া বা নবদ্বীপের শিক্ষা -জ্ঞান- ধর্মাচারণ আবহমান কাল ধরে গৌরবময় স্থান লাভ করে চলেছে। ৯৯৯ শকে আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন সেই তাঁদের দ্বারা বিদ্যাচর্চার যে সূচনা হয়েছিল তা সেন যুগের

অন্যতম নরপতি বল্লাল সেনের আমল থেকে আরও সুদৃঢ় হয়। বল্লাল সেন সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন তাই এ বিষয়ে তিনি যত্নবান হন। এই সময় হলায়ূধ ধোয়ী উমাপতিধর ও জয়দেবের আবির্ভাব হয়। জয়দেব লক্ষণ সেনের দ্বারা সমাদৃত হন। বল্লাল সেনের পর রাজা হন তার পুত্র লক্ষণ সেন। তিনি বক্তিয়ার খিলজীর দ্বারা পরাজিত হলে দেশে মুসলমান শাসন শুরু হয়। সুদীর্ঘ ৩০০ বছর চলে মুসলমান শাসন। এরই মাঝে সাহিত্যাকাশে কোন মৌলিক সাহিত্য রচনাকার জন্মগ্রহণ করেন না তবে নদীয়ার ফুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন কৃত্তিবাস। তারই রচিত রামায়ণ আজও ঘরে ঘরে সমাদৃত।

মুসলমান শাসনের সময় রঘুনাথ আচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেবকে ঘিরে নবদ্বীপে আবারও বিদ্যাচর্চার স্রোত বইতে থাকে। রঘুনাথ নবদ্বীপে চতুস্পাঠী খুলেছিলেন প্রথম। চৈতন্যদেবও এইসময় শিক্ষাবিস্তারে মনোযোগ দেন। কাশি মিথিলা দ্রাবিড় প্রভৃতি স্থান থেকে ছাত্র আসতে থাকে এখানে। শ্রীচেতন্যদেবের শিষ্যরা বঙ্গভাষাকে প্রথমে পুষ্টিদান করতে থাকে। তবে রঘুনাথকে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান নৈয়ায়িক বলা হয়ে থাকে। নবদ্বীপে শুধু ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মৈথিলী পণ্ডিতগণ একমাত্র উপাধিদানের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। যে সকল ছাত্র মিথিলায় গিয়ে উপাধি প্রাপ্ত হয়ে আসতো তারা ন্যায়শাস্ত্রে চতুস্পাঠী খুলতেন। এমনইভাবে পক্ষধর মিশ্র কর্তৃক প্রদত্ত 'সার্ব্বভৌম' নিয়ে নবদ্বীপে আসেন বাসুদেব সার্ব্বভৌম। পরবর্তীতে পক্ষধবরের শিষ্যরুপে মিথিলায় গিয়ে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন রঘুনাথ শিরোমণি। তর্ক বিতর্কে পক্ষধর তাকে মেনে ন্যায় শিক্ষক হিসাবে রঘুনাথই প্রথম উপাধিদানের অধিকার পায় ন্যায়শাস্ত্রে। এছাড়াও প্রভূত নৈয়ায়িক সেই সময় নবদ্বীপ তথা নদীয়াকে সমৃদ্ধ করেছিলেন যেমন ভবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, হরিনাম তর্কসিদ্ধান্ত, শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি প্রমুখেরা।

নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রে যেমন উন্নতি ঘটে, তেমনি স্মৃতিশাস্ত্র বিস্তার লাভ করেছিল খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে। স্মৃতির অপর নাম ধর্মশাস্ত্র [১২] জীমূতবাহন, মিশ্র বাচস্পতি রঘুনন্দন, আচার্য চূড়ামণি প্রমুখের প্রধান স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা বলে পরিচিত। প্রথমে কুল্লুকভট্ট ন্যায়শাস্ত্রে বিকাশ ও প্রচার করলেও স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ষোড়শ শতাব্দীতে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচারিত ধর্মের প্রবল আন্দোলনে জাতিভেদ প্রথা যে শিথিলতা সমাজে এসেছিল, তন্ত্রোক্ত বামাচারের কৃষ্ণ আবরণে ব্যভিচার ও সুরাস্রোত, রঘুনাথের নবন্যায় ও মুসলমান শাসনে সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবহার লক্ষ করে সামাজিক নিয়ম যে আর প্রাচীনতাকে মেনে নেবে না, বুঝতে পেরে সময়োপযোগী দেশাচার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। গয়াতে পিণ্ড দানাদি এবং হিন্দু বিধবার আচরণীয় নীতি তিনি সংস্কার করে যান। এছাড়া যে সমস্ত স্মার্ত -পণ্ডিতগণ বর্তমান ছিলেন তাদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রমুখেরা উল্লেখ্য। কালজ্ঞান না থাকলে কোন শাস্ত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। বেদপাঠের জ্ঞান যদিও সম্ভব কিন্তু বেদের যজ্ঞকর্ম্মাত্মক যে ক্রিয়াকর্ম্ম তা কালজ্ঞানছাড়া সম্ভব নয় যা জ্যোতিষশাস্ত্রের দ্বারা সম্ভব, তাই ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত।

খ্রিস্টিয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন থেকে জ্যোর্তিবিদ ও জ্যোতিষ গণনা ছিল। কারণ পণ্ডিতেরা চৈতন্যদেবের জন্মের তিথি নক্ষত্র বিচারে তার অলৌকিকতার কথা বলেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে

নদীয়ার রাজবংশ যখন আন্দুলিয়া গ্রামে বসবাস করতেন সেই সময়ে কয়েকটি জ্যোতির্বিদ গ্রহবিপ্রবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে রামরুদ্র বিদ্যানিধি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে তিনি নবাবের কাছে প্রতিনিয়ত যেতেন। নবাব একদা প্রশ্ন করেন 'আজ কি তিথি? রামরুদ্র উত্তর দেন, 'আজ পূর্ণিমা'। তবে সেই দিন পূর্ণিমা থাকলেও পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ থাকায় নবাব ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, 'কেন আপনিই না গণিয়া লিখিয়াছেন, আজ চন্দ্রগ্রহণ' তখন পঞ্জিকা গণনা হতো এবং তার গণক ছিলেন রামরুদ্র বিদ্যানিধি। যথার্থই তিনি ওই গণনা করিয়াছিলেন। মহারাজকে ছোট হওয়া থেকে বাঁচাতে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে প্রয়োগে সেই গ্রহণ সেখানে অদৃশ্য করেন। যোগবলে সমস্ত রাত্রিই পূর্ণিমা থাকে। আজ পর্যন্ত নদীয়ার হাতে নিয়মানুসারে পঞ্জিকা প্রদান করে নবদ্বীপের পণ্ডিত। এমনই বিধি সেই পূর্বকাল থেকে চলে আসছে। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে এদেশে প্রাধান্য পেয়ে থাকে যারা ওই শাস্ত্রে গণ্য ব্যক্তি তাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন কমলার্কর, প্রাণবল্লভ, পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ।

তন্ত্রের অপর নাম আগম। বৌদ্ধদিগের সময় থেকে তন্ত্রমতের উদ্ভব। কিছু কালের নাগপাশে তন্ত্র সাধকগণ যথেচ্ছাচারী ও ব্যাভিচারী হয়ে ওঠে। তন্ত্রের আসল যে মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া তার থেকে পিছিয়ে তন্ত্রে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কারণে দেশ তখন তন্ত্রে উন্মত্ত। তন্ত্র শক্তিতে সিদ্ধ এক মহাপুরুষ আবির্ভুত হন। তার নাম কৃষ্ণানন্দ। তিনি প্রথম শক্তিপূজা অর্থাৎ কালীপূজার পদ্ধতি সৃষ্টি করেন এবং ভূতচতুর্দশীতে দীপদানের প্রথা চালু করেন। যদি এই সময় মান্যগণ্য ব্যক্তিদের মধ্যেই তন্ত্রের প্রচার ছিল বলা যায়। শান্তিপুরের নিকট ব্রহ্মশাসন গ্রামে চন্দ্রচূড় ন্যায় পঞ্চানন নামে জনৈক ক্রিয়াবান তান্ত্রিক জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি প্রকাশ ও পূজাপদ্ধতি সূচনা করেন। এই সময় থেকে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ারে তন্ত্র মত চাপা পড়ে যায়।

তাছাড়া বৈদেশিক শাসনে তখন দেশ থেকে সংস্কৃত বিদ্যা ক্রমশ ম্রিয়মান হয়ে যায়। কিছু সময় ফরাসীর আদর থাকলেও ইংরেজ আমলে তাও সীমিত হয়। আর এই শিক্ষার অভাব দূর করার জন্য ১৭৮১ খ্রিঃ হেস্টিংসের সময়ে মুসলমানগণকে ফরাসী ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা ও ১৭৯২ খ্রিঃ জোনাথন্ ডানকান নামক ইউরোপীয়ের যত্নে সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় কাশিধামে।[১৩] এদেশের শিক্ষার এতই শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল যে লর্ড মিন্টো এদেশে মানে নবদ্বীপে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য বলেন।[১৪] ১৮০৭ খ্রিঃ লর্ড মিন্টো বাহাদুর গর্ভনর জেনারেল হয়ে এসে নবদ্বীপ ও ত্রিলুটের অন্তর্গত ভাউ নামক স্থানে দুইটী সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরামর্শ দান করেন। এই মতানুসারে ১৮২৩ খ্রিঃ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সনদ পুনর্গ্রহণের পর কোট অব ডিরেকটরের সভ্যগণ ভারত গবর্নমেন্টের প্রতি ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদানকল্পে অন্যূন এক লক্ষ টাকা বাৎসরিক ব্যয় করতে আদেশ দেন এই টাকায় নদীয়ায় কোন কলেজ স্থাপিত না হলেও ১৮২৩ খ্রিঃ কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন নামে একটি সভা গঠিত হয়। ওই সভা সংস্কৃত আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও পণ্ডিতদিগের বৃত্তি আদিতে ব্যয় করতে থাকে। ১৮৪৪ খ্রিঃ স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয় নামে গভর্ণমেন্ট ব্যয়ে এক শত একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এরই রাজস্বকালে ১৮৪৬ খ্রিঃ ১ লা জানুয়ারি মহাসমারোহে কৃষ্ণনগর কলেজ খোলা হয়।

সংস্কৃত ভাষার উন্নতি শিক্ষার বিকাশ শুরু হলেও বাংলা ভাষা আজও নদীয়া প্রাণ। একদা সংস্কৃতকে বাংলার জননী বলা হতো। তাই নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের স্পর্শে তার জীবনীকে প্রাধান্য দিয়ে রচনা শুরু হয়। বাংলা ভাষা প্রথম প্রাধান্য পায় যখন প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (শ্রীমদ্‌ভাগবতের) বাঙালির জন্য গ্রন্থ রচনায় বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দেন। এই দুজনের যৌথ কামনায় ক্রমশ বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

নদীয়ার অন্যতম বিখ্যাত যে সময় রচনাকার জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ফুলিয়ার কৃত্তিবাস। তিনি পাঁচালী আকারে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, ডি. এল রায় প্রমুখের স্পর্শে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে সমৃদ্ধ ও প্রাতঃস্মরণীয়। নদীয়াবাসীরা আজ এঁদের দান স্মরণ করে মাথা নত করে।

নদীয়ার সামাজিক বিবর্তন ঃ

নদীয়ার সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা লক্ষ করে থাকি বৈদিক যুগ থেকে ভারতে সমাজে নারী ও পুরুষের নানা পরিবর্তন সমাজে সংঘটিত হয়েছে। সে যুগে নারী ও পুরুষের সমকক্ষভাবেই তারা চললেও পরবর্তীতে নারী ক্রমশ অন্তরালে চলে যায়। নদীয়ায় রাজা লক্ষণ সেন প্রথম সমাজে কৌলীন্যপ্রথার সূচনা করেন। পদাধারী রাজকর্মচারীদের দ্বারা প্রজাতুষ্টির দ্বারা সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রথানুযায়ী রাজ্যশাসন করতেন। এর পরবর্তীতে ১১৯৮ খ্রিষ্ট মুসলমান শাসন শুরু হলে হিন্দু সমাজে কিছু শিথিলতা লক্ষিত হয়। অনেকেই ধর্মান্তরিত হতে থাকে। এই সময় কড়ির প্রচলন ছিল। বহুবিধ পণ্য সামগ্রী নিয়ে নৌবহর সাজিয়ে বিদেশে বাণিজ্যে যেত, এই সময় পাটের বস্ত্রের প্রচলন ছিল যেমন, পাছরা। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যে অলঙ্কার পরার প্রথা ছিল। যেমন দুল, বলয়, ঘন্টি, খারু, মদনকড়ি, ইত্যাদি।

ক্রমশ সমাজ বিলাস ব্যসনে মগ্ন হল। মুসলমান শাসনে বহু বিবাহ, খাদ্যাখাদ্যের বিধি নিষেধ ও মদ্যপান ইত্যাদিতে নীতিভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। সমাজের এমতাবস্থায় চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাবে সমাজের কলুষতা কমতেও থাকে। এই সময় মেয়েরা অলংকার বেশী পরিমাণে পরতে থাকে এবং ক্ষুঞা নাম একপ্রকার বস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিবাহে পনপ্রথার প্রচলন ছিল না। এইসময় স্মার্ত রঘুনন্দন সমাজ ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন এনে দেন, তিনি সমাজে নারী শ্রেণীকে কিছুটা অভ্যন্তরগামী করেন। তিনি বিধবাদের আচরণ স্থির করে দেন ফলত নীতিভ্রষ্ট হওয়া থেকে হিন্দু নারীদের নতুন সামাজিক নিয়মে বেধে দেন। সহমরণ প্রথা একসময় প্রবল থাকলেও মাঝে এর প্রচলন নদীয়ায় বন্ধ ছিল। রঘুনন্দন পুনরায় এর প্রচলন করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বে মুসলমান অধিকারের কালে শঠতা, প্রবঞ্চকতা, তোষামোদ, কপটতা প্রবেশ। কৃষ্ণচন্দ্র তার মত করে কিছু টা সমাজ সংস্কারে সচেষ্ট ছিলেন, যেমন রাজা রাজবল্লভ তার বিধবা কন্যার বিবাহদানে সচেষ্ট হলে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৌশলে তা নিবারণ করেন।

এই সময়ে নদীয়া ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে উন্নতি করেছিল। নদীয়ার কৃষ্ণনগর মাটির পুতুল নির্মানে ও শান্তিপুর ধূতি

নির্মানে জগদ্বিখ্যাত হয়ে ছিল। তবে পরিচ্ছদের দিক দিয়ে নারী পুরুষ উভয়ের পরিচ্ছদে মুসলমানী ভাব প্রবেশ করেছিল। পুরুষেরা সাধারণত ধুতি ও গামছা ব্যবহার করলেও রাজদরবার বা অন্য কোথাও গেলে আবা কাবা চোগা জোব্বা প্রভৃতি দেহ যষ্ঠী আবৃত করতেন। হিন্দুরা কানফুটো করে তাতে কানের পরতেন। ব্রাহ্মণেরা ধুতি ও উত্তরীয় ব্যবহার করতেন। শীতকালে শাল ও খড়ম ব্যবহার করতেন। রাজদরবারে কিংবা কোন উচ্চবংশীয় লোকের সামনে উপস্থিত থাকতে গেলে পাগড়ি পরার প্রচলন ছিল। পুরুষদের মধ্যে ডন, কুস্তি, লাঠিখেলা,সড়কিখেলার প্রচলন ছিল।

পুরুষদের মত তৎকালে মেয়েরাও মুসলমানি প্রভাব থেকে দূরে ছিল না। তাদের অনুকরণে রূপা ও সোনার অলংকার পরতেন তারা। অলংকার হীরা মুক্ত বসানোর প্রচলন ছিল এই সময়। সাধারণ পোষাক শাড়ি হলেও জানা যায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তঃপুরে মুসলিম নারীদের অনুকরণে পেশোয়াজ পরার শখ ছিল।

এই সময় ব্যবসা বাণিজ্য চলত সাধারণত নৌকাযোগে। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে কাছাকাছি জায়গা হলে বলদে টানা গাড়ি ব্যবহার করা হতো। রাজারাজড়ারা হাতি বা অশ্ব পুশতেন। যাতায়াতের কাজে তা ব্যবহার করা হতো। নারীদের মধ্যে ডুলি বা পালকির প্রচলন ছিল তখন এখনকার মত এতো তীর্থভ্রমণ ছিল না কারণ তা ব্যয় সাপেক্ষ ছিল। মোটাভাত কাপড় ছিল তখনকার দিনে প্রধান। ভাই ভাই ঠাই ঠাই রীতির প্রচলন তখন ছিল না। একান্নবর্তী পরিবার ছিল। মেয়েরা প্রাতঃকালে উঠে গৃহকর্ম সেরে স্নানাদি করে পূজাপাঠ সেরে তবে কোন কিছুতে হাত দিতেন। আর পুরুষেরা তাদের কর্মে যেতেন। ক্রমশ দেশের পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। ইংরেজদের আমলে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারে সারা দেশে লাগে পশ্চিমী হাওয়া। মানুষ তার চেতনার বদল করে। মেয়েরা যারা পর্দানশীন ছিলেন মুসলমান শাসনে তারা পেল শিক্ষার আলো। ফলত ঘরে বাইরে ঘটল অন্ধ বিশ্বাসের মূলে আঘাত। সংস্কারে পরিণত হল কুসংস্কার। মানুষ আত্মোন্নতির প্রচেষ্টায় মগ্ন হল ফলে কলহপ্রিয়তা বিনষ্ট হয়। মানুষ ব্যস্তজীবনে পদার্পণ করল। নদীয়াজেলার বিবর্তনের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় এখানকার মানুষ ছিল শান্তিপ্রিয়। আজ এখানকার মানুষ বচনপটু সুরসিক শান্তিপ্রিয়।

নদীয়ার ধর্ম ঃ

'ভারতবর্ষ নানাবেশ ..... মিলনমহান।' জাতির বর্ণের মত ধর্মাচারণে ভারতে মিশ্রতা লক্ষিত হয়। শিক্ষাদীক্ষায় যেমন নবদ্বীপ বিশিষ্টতা লাভ করেছিল তেমনি চৈতন্যদেবের ন্যায় মহাপুরুষের পাদস্পর্শে বিশ্বের দরবারে নদীয়াকে দিয়েছে অনন্যতা। এখানে প্রতিটি গ্রামের অলিতে গলিতে কোন না কোন ধর্মপ্রচারক বা অনন্য ব্যক্তিত্ব নদীয়াকে মহিমান্বিত করেছিল। ধর্ম নিয়ে তেমন কোন ঐতিহাসিক তথ্য, চৈতন্যদেবের পূর্বে না থাকলেও বলা চলে বৌদ্ধধর্ম বেশী প্রভাবিত ছিল এদেশে তবে হিন্দুধর্ম ছিল না তা বলা যায় না। কারণ রাজা শশাঙ্ক এদেশে হিন্দুধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিলেন। এরপর হিন্দুরাজা আদিসুর হিন্দুধর্ম প্রচারে সচেষ্ট হলেও পালবংশীয়দের হাতে রাজত্ব চলে যাওয়ায় হিন্দুধর্ম বিলুপ্তির পথে একধাপ এগিয়ে যায়। নবদ্বীপের নিকট সুবর্ণবিহার নামক গ্রামে পালবংশীয়রা রাজধানী স্থাপন করেন এদের আমলে নদীয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম বহুলাংশে প্রচার লাভ করে। কিছু পরবর্তীতে আসেন

সেনবংশীয়রা। শৈবধর্মাবলম্বীদের শাসনে বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সামান্ড সেনের বংশধর উল্লাল সেন ছিলেন অনেকাংশে সমাজ সংস্কারক। তার আমলে হিন্দুধর্ম অনেকটাই জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁর রাজসভাকে তিনি হিন্দুমতালম্বীদের দিয়ে সাজিয়ে ছিলেন। হিন্দুরা রাজার ছত্রছায়ায় বর্ধিত হতে থাকে। কথিত আছে রাজা লদণ সেন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তার আমলে 'গীতগোবিন্দ' রচিত হওয়া তখন থেকেই বৈষ্ণব ভক্তিরস সমাজকে সিক্ত করে তুলেছিল।

তবে নদীয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাঙন শুরু হয়ে মুসলমান শাসন শুরু হলো প্রতিপত্তিশালী দুর্দান্ত মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় সভায়ে পিছিয়ে পড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল বৈষ্ণব ও শাক্ত প্রকৃতির শৈবরা। তান্ত্রিকতার প্রভাবে সমাজের কঠোরতার মূলে হানে কুঠারাঘাত তন্ত্রের দোহাই দিয়ে সমাজ ভরে যায় ব্যাভিচারে। স্ত্রী সংসর্ব, মদ্যপান সব মিলিয়ে মানুষের মানবিকতা হয়েগেল নষ্ট, নরহত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করলো না মানুষ, কিছু মুসলমান তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে করে বসলো ধর্মান্তরকরণ। যেমন পিরালী শ্রেণি। এই সময় সমস্ত নবদ্বীপে শিক্ষায় অগ্রগামী হয়ে চলেছে তাই ধর্মের এই সংকটময় সময় নজর এড়িয়ে যায় অনেকের। তবে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ''যদাযদাহি ধর্মস্য গ্লানি ভবতিভাবত পরিত্রানায় আকুনাম বিনাশায় চতুকৃপাথ ... যুগে যুগে" তাই বলা যায় দেশকে মুক্ত করতে এই সময় নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন শ্রী চৈতন্যদেব চন্ডালে প্রেম বিতরণ করতে, তিনি যে ধর্মমত প্রচার করলেন তা বৈষ্ণবধর্ম বলে প্রচারিত ১৪০৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৪৫৫ খ্রীঃ পরমাত্মায় বিলীন হন এই ৪৮ বৎসর তিনি যে প্রেমরস প্রবাহিত করেন তারই ধারা আজ প্রচারিত।

নদীয়ায় মুসলমান সম্প্রদায় তেমন নেই বললেই চলে। যে সংখ্যক মুসলমান আছে তাদের দুইভাগে ভাগ করা যায় সুন্নী ও মোহাম্মদী। সুন্নি সম্প্রদায় আবার চারভাগে বিভক্ত হানিকি, সালেকি, সাকি ও হাম্বেলী। এখনকার মুসলমান সম্প্রদায় অতি পরিশীলিত, নম্রভাব ও ভদ্র। বর্তমানে উর্দু শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে উঠেছে এই সম্প্রদায়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উদ্‌যাপিত উৎসব হল ফাতেহা দোহাষ দোহান, শবেবরাত, ইদুজ্জোহা, ইদুলফেতর ইত্যাদি। নদীয়া, বেতাই, মেহেরপুর, দোগাছি দহকুলা কুষ্ঠিয়া, বাহাদুরপুর ইত্যাদি জায়গায় এই সম্প্রদায় বেশী বসবাস করে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি নদীয়ায় খ্রীষ্ঠান সম্প্রদায় রয়েছে, কৃষ্ণনগর, বাঙ্গাল ঝি, চাপড়া, শিকারপুর প্রভৃতি স্থানে এদের বাস। যদিও এদের অবস্থা অতি হীন। কৃষি নির্ভর করে এরা চলে। এই মিশনারীর বহুস্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল প্রতিষ্ঠা করে জনহিতকর কাজে সংযুক্ত হয়েছে। বিশ্বে এদের সংখ্যা বেশী হলেও নদীয়া এদের সংখ্যা কম।

নদীয়ায় ব্রাহ্মধর্মের অতি দীনহীন অবস্থা। ১৮৪৫ খ্রীঃ চাকদহে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং শান্তিপুরে এই সমাজের মুখপত্র হিসাবে 'যুবক' নামে একটি পত্রিকা বের হয়। ব্রাহ্মধর্মে নদীয়ায় দুজন মহাপুরুষের নাম পাওয়া যায় যেমন রামতুল লাহিড়ী ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেন ১২৫১ সালে মৃত্যু ঘটে ১৩০৬। তিনি প্রথম জীবনে

তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন সুগায়ক, বক্তা হিসাবে পরিচিত লাভ করে। পরবর্তীতে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করে পুরুষোত্তম ধামে জীবন অতিবাহিত করেন। নদীয়ার শিকারপুর গ্রামে মামার বাড়ি থেকে তিনি ছোট বয়সে মানুষ হন। তার স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মন্দির ও বছরে একবার সেখানে মহোৎসব হয়। বর্তমানে শিকারপুর তেহট্ট মহকুমার অন্তর্গত।

হিন্দু অধিবাসী নদীয়া জেলায় অধিক পরিমাণে রয়েছে। হিন্দুধর্ম আবার মুলধর্ম ও বিভিন্ন শাখাধর্মে বিভক্ত, যেমন শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও কর্তাভজা ইত্যাদি। ব্রাহ্মনের প্রায়ই শাক্ত ও শৈব। এছাড়া বৈষ্ণব এই শ্রেণী প্রধাণত হিন্দুদের মধ্যে প্রাধান্য পায়। কথায় আছে হিন্দুদের বারোমাসে তের পার্বন। যেমন দুর্গাপূজা, কালী পূজা, ভাতৃদ্বিতীয়া, লক্ষীপূজা, শিবরাত্রি, দূর্গ নবমী প্রভৃতি রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ের পূজা পাঠে রত হয়। কিছু কিছু পূজাপাঠ আছে সাধারণত তা নারীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ যেমন, সাবিত্রী ব্রত, ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে বাউল সম্প্রদায়, বৈষ্ণব সম্প্রদায়, আউল সম্প্রদায়।

বলাযায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্ঠান সর্বধর্ম এই নদিয়া সম্বন্বিত হয়েছে। প্রতিটি ধর্ম নিজ নিজ মত প্রাধান্য রেখেও এখানে মিলে মিশে বাস করে। তার মধ্যে নদিয়ার মহকুমা যেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক তীর্থস্থান।

নদীয়া কৃষি ও ব্যবসা বানিজ্য ঃ

নদীয়া জমি অধিকাংশই বেলে মাটি। ফলত উর্বরা শক্তি কম। এখানকার জমিতে হৈমান্তিক ধানের চাষ সাধারণত হয়ে থাকে। তবে এখানকার সেচ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় প্রাচীন নদীয়াতে তেমন চাষবাস হত না। শুধুমাত্র বৃষ্টির জল ও নদীর জলের উপর ভরসা করে চাষ কাজ চলতো। চাষ কাজ করতে গিয়ে জমিতে যে পরিমাণ খরচ করার প্রয়োজন হয় তা তৎকালিন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। হালের গরু, সেচের জল, শস্যের বীজ, সার ইত্যাদির প্রয়োজনে মহাজনের কাছে করতে হত ফলত ঃ মহাজনের কাছে বাধা থাকত তাদের জমি। ফলত কৃষকরা সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। তবে পাট চাষ করে কিছুটা উন্নতি চেষ্টা করলেও তারা ক্রমশ হতদ্যোম হয়ে পড়ে। তবে বর্তমানে এই অঞ্চলগুলিতে মানুষ কিছু সবজির চাষ করে অর্থের মুখ দেখতে পেয়েছে। নদীয়ার কৃষিতে বর্তমান কলা পাট ও পান উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে বর্তমান সমাজকে।

আগের দিনের মত শুধু বৃষ্টিকে কেন্দ্রকরে চাষবাস থেমে নেই। উন্নত বীজ, সেচ ব্যবস্থা ও সরকারী সাহায্য বর্তমানে নদীয়াতে চাষাবাদেও প্রভূত উন্নতি হয়ে চলেছে। এখন আর একফসলি ধানী-জমি নেই বছরে তিনবার ফসল উৎপন্ন হয়ে চলেছে। ধান কেটে রবীশস্য ও তার পর ধান ফলিয়ে চাষীরা আগের থেকে অনেকটা সুখের মুখ দেখেছে। এছাড়া যেমন শান্তিপুরে আখেড় গুড় থেকে চিনি প্রস্তুত, হিজলীতে- তামাক চাষ, চাকদহ, তেহট্ট এলাকায় পানের বরজ এছাড়া কলার চাষ করে বর্তমানে চাষী ভালো আয় করে চলেছে। তবে সরকারী সাহায্য পেলে তা আরো এগিয়ে যাবে।

নদীয়া এমন একটা জায়গা যার নাম করতে গেলে প্রথমেই শান্তিপুরের তাঁত ও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের কথা

মনে আসে, যা ব্যবসায়িক দিক দিয়ে পরিচিতি দান করেছে নদিয়া জেলাকে বিশ্বে। উনবিংশ শতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশম কুঠি ছিল শান্তিপুর [১৩] তৎকালে প্রভূত বস্ত্র রপ্তানি হত বিদেশে। শান্তিপুরে বহু তাঁতির বাস, এছাড়া ফুলিয়া, নবদ্বীপ সব জায়গার বুননের উপর নির্ভর করে ব্যাবসায়িক দিক দিয়ে সাফল্য লাভ করে চলেছে এই বস্ত্র বুনন শিল্প। তবে তেমনভাবে সরকারী সাহায্য না পাওয়ায় শান্তিপুরে বয়ান শিল্পের মৃতপ্রায় অবস্থা। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা শিল্প আজ বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে। যেমন মাটির পুতুল ও মাটির ফল নির্মাণ। এক্ষেত্রেও সরকারী সাহায্য না পেয়ে এই শিল্প আজ নষ্ট হতে চলেছে। শিল্পীরা নিজেদের বৃত্তি ছেড়ে অন্য বৃত্তিতে যোগদান করেছে। তবে কিছু শিল্পী আজও এই ধারাকে ধরে রেখে বাঁচিয়ে রেখেছে মাটির এই শিল্পকে। তৎকালে নদীপথে ব্যবসা বাণিজ্য চলতো বেশী। কিন্তু বর্তমানে নদী মজে যাওয়ায় বহু অর্থ ব্যয় হয় ব্যবসার ক্ষেত্রে যদিও রেলপথ থাকায় কিছুটা সুবিধা হয়ে চলেছে। তবে মাটির ও তাঁত শিল্পে পুরুষের তুলনায় এখন নারীরা অধিক এগিয়ে এসেছে।

তৎকালে নদীয়ার অন্যতম মহকুমা ছিল মেহেরপুর যা এখন তেহট্ট মহকুমা কিয়দঅংশ রয়েছে। এখানে একদা রেল (লাইন) ব্যবস্থা হলেও বর্তমানে সড়ক পথ একমাত্র ব্যবসা বাণিজ্য চলার মাধ্যম। এখানে একসময় উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত হতো যেমন রসকদম্ব, ক্ষীরের মিঠাই বর্তমানে কৃষ্ণনগরে সরপুরিয়া ও সরভাজা মিষ্টান্ন শিল্পে নাম করেছে। তেমনি অপর মহকুমা কুষ্ঠিয়া পাঠ ও ধান চাষে প্রসার থাকলেও এই অঞ্চলটিকে ঘিরে একসময় ছিট কাপড়ের মিল ‘মোহিনী মিল’ তৈরী হয়েছিল।

বর্তমানে নদীয়া অবিভক্ত নদীয়া অংশ বিশেষ বাদ দিয়ে তৈরী হলেও কিছু মানুষ আজ শিল্পকে ভালবেসে এগিয়ে চলেছে, পাটকে কেন্দ্র করে বস্ত্রশিল্প উন্নতির এখানে প্রভূত সম্ভবনা, তাছাড়া আখকে কে করে চিনি, ইত্যাদির চিন্তা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নদীয়াকে। সরকারী সাহায্যের আশ্বাসে শিল্পীরা হয়েছে আশান্বিত। ফলত তাদের আশায় গাড়ে উঠছে নতুন ব্যবসার নতুন দিক।

তেহট্ট মহকুমার জন্ম ইতিহাস ঃ

প্রাক্ স্বাধীনতা পূর্বে নদীয়া জেলাতে পাঁচটি মহকুমার সন্ধান পাওয়া যায়। অবিভক্ত বঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও নদীয়া জেলার সম্পূর্ণ যে ভৌগলিক সীমানা ছিল তাতে দেখা যায় মেহের পুর, রানাঘাট, কষ্ণনগর, চুয়াডাঙ্গা, ও কুষ্টিয়া এই পাঁচটি মহকুমা ছিল যদিও কৃষ্ণনগরকে কৃষ্ণনগর সদর হিসাবে ধরাহত। করিমপুর, গাংনী, মোহেরপুর ও তেহট্ট এই চারটি থানা নিয়ে মেহেরপুর মহকুমা গঠিত হয়।[১৫]

মেহেরপুর মহকুমা পরে গঠিত হয়। ২০ থেকে ২২ ক্রোশ অর্ধাৎ ৪০-৪৪ মাইলের মধ্যে তখন কোন মহকুমা গঠিত হয়নি। করিমপুরে একজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়। সেই সময় ইতিহাস প্রসিদ্ধ নীলকরগণ নীলচাষের জন্য যে অঞ্চল গুলি বেছে নিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম শিকারপুর। শিকারপুর ১৫২টি নীলকুঠির সদর ছিল। ওয়াটসন কোম্পানী এই শিকারপুরের এত কাছে একজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট কাজ করবেন তা মেনে নিতে পারেননি। শিকারপুর, আঁধারকোটা ,

চেঁচানিয়া, হোগলবাড়িয়া ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে নীল চাষ করা হত। সেই কারণে এই নীলকরদের প্রচেষ্টায় শেষ পর্যন্ত করিমপুর নিযুক্ত ডেপুটি মাজিস্ট্রেটকে তুলে নিয়ে একেবারে অনুপোযুক্ত মেহেরপুরকে মহকুমা করা হয়। করিমপুর একটি ডাকঘর ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছিল যার মধ্যে ডাকঘরটি চালু থাকলেও বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। আঁধারকোটাতে স্থাপিত থানা করিমপুরে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর তেহট্ট মহকুমার জন্ম হয়। বর্তমান নদীয়া জেলা রানাঘাট, কৃষ্ণনগর সদর, কল্যাণী মহকুমার পর ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তেহট্ট মহকুমার সূচনা হয়। করিমপুর ১, করিমপুর ২, তেহট্ট ১ ও তেহট্ট ২ এই চারটি সমষ্টি অঞ্চল নিয়ে এই মহকুমার জন্ম হয়। স্বর্গীয় মাধমেন্ধু মাহান্ত-র স্বপ্ন পূরণ হয়।

চারটি ব্লক নিয়ে গঠিত এই মহকুমাকে জলঙ্গী নদীর উপর সেতু দ্বারা ৩৪ নং জাতীয় সড়কের সাথে যুক্ত করেছে। দেবগ্রাম অংশে, এই মহকুমাটি নদীয়া জেলার দক্ষিণে অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ ২২° ৫৩ ́ ও ২৪° ১১ ́ উত্তর অক্ষাংশ। ৮৮° ০৯ ́ ও ৮৮° ৪৮ ́ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।

আয়তন ঃ	৮৭৩.৪৭ বর্গ কিলোমিটার।
পরিসীমা ঃ	এই মহকুমার উত্তর দিকে মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত, দক্ষিণে চাপড়া ব্লক ও নাকাসিপাড়া থানা অবস্থিত। পশ্চিমে কালিগঞ্জ ব্লক ও মুর্শিদাবাদ জেলা অবস্থিত। পূর্বে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত।
জনসংখ্যা ঃ	পুরুষ ঃ ৪০৯২৩৩, মহিলা ঃ ৩৮৭০১২,
সাক্ষরতার হার ঃ	শিক্ষিত পুরুষ ২৫৮৮১২, শিক্ষিত মহিলা ঃ ২০৮৫২৫, অশিক্ষিত পুরুষ ঃ ১৫৪৮২১, অশিক্ষিত মহিলা ঃ ১৭৪৪৮৭,
বিধান সভা ঃ	৩ টি।
ব্লক ঃ	০৪টি।
থানা ঃ	০৪টি।
পঞ্চায়েত ঃ	৩৬টি।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৪৬ ফুট।

তেহট্ট মহকুমার সমাজ সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমান ঃ

বর্তমান তেহট্ট মহকুমা অবিভক্ত বাংলার মেহেরপুর মহকুমার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তৎকালিন নদীয়া জেলা যে চারটি মহাকুমার বিভক্ত ছিল তার মধ্যে মেহেরপুর একটি। প্রথমে করিমপুরে মহকুমা স্থাপিত হলেও নীলকর সাহেবদের কর আদায়ে এটি প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনিক দিক দিয়ে নীলচাষে সুবিধা ও নীলকরদের অত্যাচার সম্মুখে এসে পড়ছিল এমতাবস্থায় নীলকর সাহেব ওয়াটসন কোম্পানীর সুবিধার কারণে মেহেরপুরে মহকুমা স্থানান্তরিত করে। তথ্য

অনুযায়ী মাত্র দুবছর করিমপুর মহকুমা হিসাবে ছিল। তবে তেহট্ট মানে অতীত মেহেরপুর মহকুমা নদীবহুলতার কারণে নীলচাষের উপযোগী হওয়ায় নীলকরদের প্রথম পছন্দ ছিল। কৃষিক্ষেত্রে ছিল চাষযোগ্য, তাই তৎকালে মানুষের একমাত্র জীবিকা ছিল চাষাবাদ। কৃষিকে নির্ভর করে এই অঞ্চলের মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। আর কোন অঞ্চলের ডীপস্ট্রাকচারের উপর সুপারস্ট্রাকচার নির্ভর করে তাই তেহট্ট মহকুমার নারী ভাষার আলোচনায় তেহট্ট মহকুমার সমাজ সংস্কৃতির পর্যালোচনাকে গুরুত্ব দিতেই হয়।

প্রধানত কৃষি নির্ভর হওয়ায় এই একমাত্র কারণ হল নদী। প্রধানত জলঙ্গী, ভৈরব, মথাভাঙ্গা, চূর্ণী ও পদ্মা এই অঞ্চলকে বেষ্টিত করে রেখেছে। বর্ষাকালে বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে এই অঞ্চল। এখানকার মাটি কোথাও কোথাও দোআঁশ আবার কোথাও কোথাও বেলে। এই এলাকার নীলকর তাদের কায়েমী স্বার্থ পুরণের পরবর্তী সময়ে ক্রমশ স্বাধীনতার পর এদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। ফলত নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়, এমতাবস্থায় চাষীরা পুনরায় কৃষি কাজে যুক্ত হয়ে পড়ে। তৎকালে জমি প্রধানত এক ফসলি হওয়ায় কৃষকেরা আর্থিক ভাবে দুর্বল ছিল। পরবর্তী সময়ে চাষের পদ্ধতি ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে মেহেরপুর এলাকার মানুষ কৃষি নির্ভর বেশী হয়ে পড়ে। অতীত মেহেরপুর বর্তমানে তেহট্ট মহকুমায় প্রধানত ধান, পাট, পান, কলা, রবিশস্য ইত্যাদি চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া ফল চাষেও এগিয়ে এসেছে এই সমস্ত অঞ্চল। ফলত তেহট্ট অঞ্চলে ফল চাষ প্রাধান্য লাভ করেছে এই তেহট্ট অঞ্চলের বেঁচে থাকার প্রধান উৎস চাষ। এই চাষের উপর নির্ভর করে 77.56% কৃষক বেঁচে আছে। এই অঞ্চলের অন্যতম গ্রাম করিমপুর বর্তমানে দোফসলি চাষের উপযোগী যেখানে 100% জমি কৃষি উপযোগী। 91.30% জমি এখানে একফসলি তো বটেই।

Block wise net cropped area and area shown more then onee (hac) source:District census Hand book

sl No	Name of the Block	Net area under cultivation	Area is which more then I area crop is grown	% of net croaped ahere more then 1 crop is grown
1	Karimpur-I	15195.5	4532	95.63
2	Karimpur-II	17191	17191	100
3	Tehatta-I	19152	15350	80.15
4	Tehatta-II	15256	13910	91.18
	Total	66794.5	60983	91.3

সাধারাণত তেহট্টে চাল, গম, আলু, কলাই, তিল, সরসে, পাট এছাড়া কলা, আম, লিচু চাষ ও কোথাও কোথাও ফুল চাষ ক্রমশ বাড়ছে। তেহট্ট ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল করিমপুর প্রধানত কলা চাষে উৎসাহী হয়ে উঠেছে এবং কলা উৎপাদনে বানজ্যিক সুবিধা তাদের উৎপাদনে উৎসাহ দান করছে। করিমপুর অঞ্চল হলুদ উৎপাদনে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে

করিমপুর অঞ্চল প্রধানত কলা ও পান চাষে ব্যবসাহিক দিক দিয়ে অর্থকরী সাফল্য লাভ করে চলেছে আর তেহট্ট অঞ্চল পাট চাষে। পাটের সোনালী আঁশ ও পাটকাঠি বাছাই এ প্রয়োজন প্রচুর শ্রমিক। প্রধানত করিমপুর ও তেহট্টে নদীর প্রধান্য থাকায় কলা, পান ও পাটের মত শ্রমিক প্রধান অর্থকরী ফসল অঞ্চলের উন্নতি সাধনে তৎপর।

কলা উৎপাদনে সেই অর্থে মহিলা শ্রমিক না লাগলেও ধান, পান ও পাট চাষে পুরুষের পাশাপাশি মহিলা শ্রমিকের আবশ্যিকতা বেশী হয়ে পড়ছে। পানের বরজের স্বল্প পরিসরে মহিলারা অধিক সচ্ছন্দ। পাটের আঁশ ছাড়ানোর পর শুকানো, পাটকাঠি বাছাই এর মত ধৈর্যশীল কাজে আজ তেহট্ট করিমপুরের মত এলাকার মহিলারা এগিয়ে এসেছে পুরুষের পাশে। ফলত এই ক্রমবর্ধমান কাজের চাহিদা এই অঞ্চলের মানুষকে Primary sector থেকে ক্রমশ Tertiary sectoryএরপ্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলে 77.56% Primary sector 3.01% secondary sector 19.45% Tertiary sector.

District statisfial Han...Working population of Tenatta subdivision-2007.

sl no	Name of the Blok	Main worker	Marginal	non worker
1	Karimpur-I	48276	6851	109598
2	Karimpur-II	55782	9888	126278
3	Tehatta-I	62093	9663	145733
4	Tehatta-II	37985	4258	91888
	Total	204136	32660	473497

তেহট্ট মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে কলা, পাট, আখ, পান ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে প্রচুর শিল্পের ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র বিস্তারের চাহিদা তৈরী হয়েছে। যেমন পাট থেকে বস্ত্র, ব্যাগ সাজসজ্জা ইত্যাদি গৃহনির্মানের সামগ্রী তৈরী যা বর্তমানে করিমপুর তেহট্ট নাজিরপুর বেতাই শিকারপুর ইত্যাদি অঞ্চলে ছোট ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের চাহিদা সৃষ্টি করেছে। বলা বাহুল্য এই অঞ্চল গুলিতে কৃষিনির্ভর শিল্পের সম্ভবনা প্রচুর বর্তমানে তাই মানুষ যেমন পানের স্টল, আখের রসের স্টল ছোট ছোট মাটির শিল্প তৈরী পাটের গহনা তৈরী পাটকাটি কে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ভাবে এই অঞ্চলে শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে। অর্থাৎ তেহট্ট মহকুমায় প্রচুর পরিমাণে কৃষি নির্ভর শিল্প গড়ে ওঠার চাহিদা রয়েছে। আর এই কারণে বর্তমানে পুরুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে নারী।

প্রধানত তেহট্ট মহকুমার অধিক অংশ নমশুদ্র ও আধিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। এই অঞ্চলের নারীরা পুরুষের প্রায় সমকক্ষ। শারিরীক ভাবে সক্ষম এই সমস্ত মহিলারা ধানচাষ, পাট চাষ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রে সমান ভাবে দক্ষ। আর এই কারণে মানুষের প্রয়োজনে বেড়ে উঠেছে শিক্ষার প্রয়োজন। নিজেদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য সাধন করতে যেমন ভাবে পুরুষেরা শিক্ষা গ্রহণ করছে তেমনি শিক্ষা গ্রহণ করছে নারী। নদীয়া জেলার এগ্রিকালচার কে প্রথম সারির করে

তুলেছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম শাখা, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর মত প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করে নারী ও পুরুষ যেমন কৃষি কে করে তুলেছে পরিশীলিত তেমন কর্মক্ষেত্রে কৃষিভিত্তিক শিল্পকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে এসেছে ব্যবসার কাজে। কেমন ভাবে পানের মত পচনশীল ফসলকে পান সমিতির সহায়তায় দেশ ও দেশের বাইরে রপ্তানি করে লাভবান হয়ে ওঠা যায় কিভাবে পাটকে কাজে লাগিয়ে তার যথোপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করে বাইরের মার্কেটে চাহিদা তৈরী করে অর্থকরী ফসল হিসাবে রপ্তানি যোগ্য করে তুলতে পারে ধানের বিচালী বিভিন্ন সবজির রক্ষনাবেক্ষণ পদ্ধতি ফলে শিল্প হিসাবে তার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়ানো প্রচেষ্টা আজ তেহট্ট মহকুমাকে বিশ্বের দরবারে অনেকটাই পরিচিতি প্রদান করছে।

বিশ্বায়ণের সাথে নিজেদের সংযুক্তির কারণে কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি ও সারের প্রয়োগ করে এক ফসলি জমিকে দুই বা তার অধিক ফসলিতে পরিণত করে ক্রমশ যোগান বাড়িয়ে চলেছে মানুষ। আর এই কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নারী ও পুরুষের শিক্ষা। যখনই একটি জনপদ শিক্ষা গ্রহণ করবে তখন সেখানকার সমাজব্যবস্থার ব্যপকতর পরিবর্তন সাধিত হবে। তেমনি ভাবে তেহট্ট মহকুমায় 387 টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 14টি upper primary school এবং 35টি উচ্চতর বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া রয়েছে Higher secendary School

Primary school in Tehatta- 2006-2007. District Census Handbook-2007

Sl No	Name of the Blocks	No of Primary school	No of Students	No of Teacher
1	Karimpur-I	110	20243	416
2	Karimpur-II	97	16646	347
3	Tehatta-I	129	22056	427
4	Tehatta-II	79	15005	296
	Total	415	73950	1486

Middle School

Sl No	Name of the Blocks	No of Middle school	No of Students	No of Teacher
1	Karimpur-I	2	2345	13
2	Karimpur-II	1	648	8
3	Tehatta-I	2	1932	17

4	Tehatta-II	1	453	6
	Total	6	5378	44

The Block wise distribution of High School.
District census Handbook-2007

Sl No	Name of the Blocks	No of High school	No of Students	No of Teacher
1	Karimpur-I	7	7249	79
2	Karimpur-II	8	8490	68
3	Tehatta-I	7	12813	117
4	Tehatta-II	3	5168	38
	Total	25	33720	302

High Secondary School

Sl No	Name of the Blocks	No of High school	No of Students	No of Teacher
1	Karimpur-I	10	3638	178
2	Karimpur-II	6	2400	102
3	Tehatta-I	9	4622	178
4	Tehatta-II	5	2347	96
	Total	30	13007	554

এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বর্তমানে তেহট্ট মহকুমাকে শিক্ষায় উন্নততর করে তুলেছে। আর এই শিক্ষার কারণে তেহট্ট মহকুমার মানুষকে সমাজ ও সংস্কৃতি অনেকাংশেই প্রভাবিত হয়েছে। ভাষা হচ্ছে মানুষের সমাজের ধারক ও বাহক।

তেহট্ট মহকুমা অতীত মেহেরপুর যা বাংলাদেশের সংলগ্ন হওয়ায় এখান কার ভাষা বাংলার ভাষার সাথে অনেকাংশে

মিলে যায়। তবে আরো বলতে গেলে বলতে হয় নদীয়া জেলা অতীতে শিক্ষা ক্ষেত্রে বেশ প্রভাশালী ছিল। যেমন নবদ্বীপের টোল, শ্রী চৈতন্যদেবকে ঘিরে বিদ্যাচর্চা এছাড়া নদীয়ার জন্মলাভ করা বিভিন্ন মনিষী তাঁদের স্পর্শ নদীয়ার ভাষাকে করে তুলেছিল সমৃদ্ধ। সেই প্রভাব কিছুটা হলেও এসে পড়ে তেহট্ট অঞ্চলের ভাষা যা মান্যভাষা থেকে অনেকাংশে আলাদা। এছাড়া নমশুদ্র জাতি ও পার্শ্ববর্তী মুসলমান সম্প্রদায়ের বাস তাদের ইসলামিক সংস্কৃতি ও মুর্শিদাবাদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব তেহট্ট মহকুমার সংস্কৃতিকে মিশ্রধর্মিতায় পরিণত করেছে। যদিও এই অঞ্চলে রাঢী উপভাষার প্রাধান্য এখনো লক্ষ করা যায় তবে তা বাড়ীর অন্দর মহলেই সীমিত। মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব আজ পুরুষের মুখ থেকে বাড়ির অভ্যন্তরে নারীর মুখে সম্প্রসারিত হয়েছে।

বলাবাহুল্য হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের সমন্বয় ১৯৭১ সালে ভারত বাংলাদেশ বিভাগে কিছু বাংলাদেশি মানুষের এদেশে উঠে আসা, এদেশী কিছু আদিবাসী, কর্মের প্রয়োজনে তেহট্ট মহকুমা থেকে কলকাতা অভিমুখী ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার মানুষ সকলের সমন্বয়ে এদেশের স্থানীয় ভাষা কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এখানের সমাজ ও সংস্কৃতিতে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। কৃষিক্ষেত্রের কাজে ব্যর্থ প্রচেষ্টা না চালিয়ে, শুধু মাত্র চাকুরী কে সম্বল না করেও এখানের মানুষ ক্রমশ পাট, কলা, পান, ফল মশলা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে ক্ষুদ্র শিল্প। শুধু খাদ্যদ্রব্য, পোশাক পরিচ্ছদেই ওই ব্যবসার কাজে অর্থাৎ ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলতে এখানকার মানুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে। এই অঞ্চলে শিল্পের সম্ভবনা প্রভূত। পাশাপাশি দুগ্ধজাত দ্রব্য থেকে উৎপাদন, গবাদি পশুকে কেন্দ্র করে দুধের মিল পনীর মিষ্টান্ন উৎকৃষ্ট মানের তৈরী করতে প্রয়োজন হচ্ছে কারীগর ও শ্রমিকের। এছাড়া এই এলাকা পলু চাষ করে বয়ন শিল্পের কার্যে নিযুক্ত হচ্ছে যমশেরপুর এলাকাবাসী যেখানে মহিলা শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে প্রভূত মাত্রায়।

স্বাধীনতার এতো বৎসর পরে একদা নীলচাষ ও নীলকুটি এলাকা কলকাতা থেকে অনেক দূরবর্তী হওয়ার অভাবে উন্নতি সংঘটিত হয়নি। তবে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু মানুষ কাজের তাড়নায় আজ কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্রশিল্পের একুট একটু করে সম্ভবনা সংঘটিত হচ্ছে মানু য সড়ক পথে NH 34 এর উন্নতিতে কলকাতাকে অনেকটাই কাছে করে দেখেছে, ফলত শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নতি হচ্ছে এই অঞ্চলে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এই মহকুমা পিকনিককে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পও গড়ে তোলার কাজ আলোচনা চলছে। তাই বলা যায় সেই অর্থে এই এলাকার মানুষের কর্মজীবনের উন্নতি অতি ধীরে ঘটলেও একে বারে বন্ধ হয়ে যায় নি। তবে এই উন্নতি অনেকটাই দ্রুত ঘটতো যদি নারীরা কর্মতৎপর বেশী হতো। হিন্দু ও মুসলমানের রীতির কারণে পূর্বে নারী গৃহবন্দি হলেও আদিবাসী সম্প্রদায়ে সর্বদায় নারী ছিল কর্মতৎপর। আজ নারী শিক্ষার কারণে অনেকটাই কর্মাভিমুখী, এর অন্যতম কারণ অবশ্য রাজ্য সরকারের কর্মঅভিমুখী বিভিন্ন পরিকল্পনা।

বলা যায় প্রাচীন নদীয়ার সংস্কৃতির স্পর্শ, বর্তমানের শিক্ষার অগ্রগতি ইত্যাদি তেহট্ট মহকুমার ভাষা শিক্ষা সংস্কৃতিকে অনেকটাই সমৃদ্ধ করেছে। সড়ক যোগাযোগ মানুষকে কলকাতার সংস্কৃতির সাথে যুক্ত করায় এক মিশ্র সংস্কৃতি সমাজ, সাহিত্যকে ও সমৃদ্ধ করেছে। ঘটিয়েছে সমাজ সংস্কৃতি পরিবর্তন বা ভাষাকে করেছে তরান্বিত।

নদীয়ার প্রত্যন্ত এলাকা তেহট্টে শুধু সমাজ জীবনের পরিবর্তনই ঘটেনি সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও নানা পরিবর্তন

ঘটেছে। সমাজে ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় শিক্ষা তা পুঁথিগতই হোক বা মানসিক হোক। তেহট্ট মহকুমার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই অঞ্চলের বিভিন্ন শতবর্ষ অতিক্রান্ত স্কুল। যেখানে ব্রিটিশরা তাদের প্রয়োজনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এদেশীয়দের শিক্ষিত করতে সচেষ্ট হয় এছাড়া এলাকার জমিদার শ্রেণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিস্থান প্রমাণ করে সুদীর্ঘকাল ব্যাপী তেহট্ট মহকুমার মানুষ যুগকে মানিয়ে নিতে সচেষ্ট ছিল কিন্তু সম্মানের সুনজরের অভাবে তেমন ভাবে এগিয়ে যেতে পারে নি। বিভিন্ন বাউল সম্প্রদায়ের আখড়া, কীর্তনাদিক সঙ্গীত, কবিগানের আসর এ অঞ্চলের সংস্কৃতি প্রিয়তাকে প্রমানিত করে। সর্বোপরি এ অঞ্চলের মানুষের মানবিক দিক দিয়ে যে উন্মেষ দেখা যায় তা দৃষ্টান্ত মূলক। আমরা প্রধানত লাভ করে থাকি হিন্দু ও সুসলমান, খ্রীষ্টান একই জেলায় বসবাস করলেও তাদের একটি অঞ্চল বা পাড়া বিভক্ত থাকে। কিন্তু তেহট্ট মহকুমার এমন অনেক অঞ্চল আছে যেখানে একই পাড়াতে পাশাপাশি বাড়িতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান বৈষ্ণব বসবাস করছে নির্দ্বিধায় যেমন শিকারপুর। হিন্দু ও মুসলমান এর মসজিদ ও মন্দিরের অবস্থান নিয়েও চলে দ্বন্দ্ব। কিন্তু নাটনা বটতলা নামক স্থানে হিন্দু মন্দির ও মুসলমানের ইদগাহ মাঠের পাশাপাশি অবস্থান প্রমান করে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক দৃষ্টান্ত মূলক উদাহরণ। যা আজকের দোলাচলতায় একান্ত প্রয়োজন।

পরিবর্তিত সমাজ পরিবেশে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা ঃ

সভ্যতার সূচনা লগ্নে সমাজ প্রধানত ছিল নারীর উপর নির্ভরশীল। কিছু সমাজ তাত্তিকেরা সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত জানান যে সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় নারী ক্রমশ তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। আর্য সভ্যতাতে ও নারীর সহাবস্থান লক্ষিত হয়েছে। আদিম কালে নারী ও পুরুষ উভয়ে ছিল সমমানের। কারণ তখন তাদের প্রধান লক্ষ ছিল ফলসংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ পরবর্তী কালে আগুনের আবিস্কার ও শিকারকে জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার পর নারীর স্বাধীনতা কমে যায় অনেকাংশে। কারণ শিকার করতে গেলে যে শারিরীক সক্ষমতা দরকার তা নারীর না থাকায় নারী পিছিয়ে পড়ে গৃহবন্দি হতে থাকে। ফলত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা তারা হয়ে পড়ে পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল। এখানেই তাদের স্বাধীনতা খণ্ডিত হয়েছিল। পুরুষের কাঁধে কাধ মিলিয়ে সমকক্ষ হয়ে চলার যে রেওয়াজ নারী তার প্রতিবন্ধকতার যুগে অগ্রগতির সাথেই শুরু হয়।

মানুষ আদিতম জীবিকা খাদ্য আহরণ রীতি ত্যাগ করে যখন শিকারে মানোবিবেশ করল তখন থেরে শুরু হল নারীর পরধীনতার ইতিহাস। তবু সমাজতাত্তিকেরা মনে করেন নারীই কৃষিসভ্যতার প্রবর্তক। তারা অজানতেই সে সূচনার বীজ বপন করে। যার মূল মন্ত্র রচিত হল নারীর দ্বারা। তাই শিকার ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষতা লাভ না করলে কৃষিক্ষেত্রে নারীর পুরুষ উভয়েই সমান ভাবে কাজ করতে থাকে। যার কিছুটা পরিচয় আমরা আজও আদিবাসী জাতির মধ্যে লক্ষ করে থাকি। যেখানে কৃষিক্ষেত্রে বীজ বপন, চারাগাছ রোয়া, ধান বা ফসল কাটা গৃহকাজ ছেড়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সমধর্মী। কিন্তু প্রকৃতি গত ভাবে দূর্বল নারী স্নেহপ্রবনা ও শারিরীক ভাবে পুরুষের তুলনায় কম শক্তিশালী হওয়ায় গৃহকাজ ও সন্তানধারণ ও সন্তানপালন ইতাদিতে ক্রমশ ব্যাবহৃত করে দেওয়া হল। নারীকে শিকার প্রথা, গোষ্টি প্রথা, মানুষ যতই

অগ্রগামী হল নারী হল ততই গৃহবন্দি। পুরুষ নারী কে তার অধিকারের বস্তুতে পরিণত করল। নারী পরাধীন হল।

নারী সেভাবে স্বাধীনতা না পেলেও বৈদিক যুগে আমরা লক্ষ করে থাকি নারী শিক্ষার অধিকার পেয়েছিল ঘোষা অপালা মৈত্রী ইত্যাদি বেদচর্চার সাথে যুক্ত ছিল কিন্তু যুগের পরিবর্তন থেমে থাকে নি রাজরাজাদের যুগে গৃহবন্দি নারীদের কিছুটা শিক্ষা গ্রহণের অধিকার থাকলেও সাধারণ পরিবারে তার ছোয়া প্রায় পৌছায় নি বলা যায় ক্রমশ পুরুষ তা প্রয়োজনে নারীকে বেদ পাঠে ও বঞ্চিত করতে থাকে। ক্রমশ শিক্ষা থেকেও নিজেদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয় নারী। এই ভাবে ক্রমশ তারা কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাক্ষেত্র উভয় থেকে সরে গিয়ে ঘোমটা প্রথা ও পর্দাপ্রথার আড়ালে চলে যায় নারী। এর পর আসে ত্রোয়দশ শতাব্দি যেখানে ভারতবর্ষে ঘটে মুসলমান বিজয়ের পর্ব। এই সময় দলে দলে মানুষ হিন্দু ধর্ম থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে। কোথাও সহজে কোথায় জোর পূর্বক ঘটে ধর্মান্তরিত করণ। এই নব ধর্মের নিয়মকানুন ধর্মান্তরিত মুসলমানরা সেই অর্থে জানতোনা। ফলতো ঘটে নানান অপপ্রচার।

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শুধু পুরুষ নয় নারীর শিক্ষার আবশ্যিকতার নির্দেশ রয়েছে কিন্তু তৎকালীন অশিক্ষিত বাঙালী সম্প্রদায় কোরাণের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম ছিল না। মুসলমান রাজ কায়েম করতে গিয়ে আলেম ওলামারাও ধর্মন্তরিত মুসলমানদের কোরাণের বাহ্যিক অর্থ ও নির্দেশাবলী কে নিজেদের মত করে প্রচার করায় কোরাণের সঠিক অনুধাবন করা সম্ভব হয় নি। শরীয়ত অনুসারে অবাধ বিচরণ ও ধর্মীয় নিয়মের বেড়াজালে আটকে পড়ে নারী। সাধারণ সমাজের নারীর সাথে তাদের পার্থক্য ঘটে যায় তারা পর্দানসীন তো বটেই, চলে যায় গৃহের অন্তরালে। নারী জীবনে ফলত নেমে আসে অন্ধকার। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের ফলে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তো ঘটেই নি ক্রমাগত তারা হয়ে চলে শোষিত নিপীড়িত।

শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ই নয় হিন্দু সমাজেও নিয়মের বেড়াজাল নারীর জীবন যাত্রাকে স্থবির করে তোলে। পর্দা প্রথা না থাকলেও অন্দরমহল থেকে বাইরে আসার কোন নিয়ম ছিল না, এছাড়া ঘোমটা দান, সবথেকে বড় বিষয় সতীদাহ প্রথা যেখানে পুরুষ ধর্মের দোহায় দিয়ে কদর্যভাবে দিতো নারীকে বলী। অবশ্য এসমস্তই ছিল পুরুষের অধিকার স্থাপনের কৌশলে যেখানে নিয়মের বেড়াজালে নারী হয় পরাধীন। ছিল কৌলীণ্য প্রথা নারীর শোষণ যে তীব্র মাত্রায় হোত তার পারিচয় এখানেও পাওয়া যায়। এই সমস্ত নিয়ম কোন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল না তবে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলায় বেশি ছিল।

এরপর আসে ব্রিটিশরা, ইংরেজ আমলে নারী যে পরাধীন ছিল না তা নয় শোষিত নিপীড়িত হত নীলকর সাহেবদের হাতে পুরুষ ও নারী উভয়ে। এখানে এদেশীয় দের সাথে যুক্ত হয়েছিল কিছু লোভী ব্রিটিশ। যার উল্লেখ আমরা পায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটকে। যেখানে ক্ষেত্রমনির শালিনতা খণ্ডিত হয় নীলকর সাহেবের লোলুপতার কাছে। তবে এই সময় কিছুটা নারী শিক্ষার প্রসার ঘটে। পাশ্চাত্যের প্রভাবে এদেশে নারীরা শিক্ষিত হতে চেষ্টা করলেও, তার ব্যপকতা লাভ করে না বরং এদেশী ধর্মাচারণ কারীরা তার কণ্ঠরোধ করে দেয়।

তৎকালিন ভারতবর্ষের নারীর যে অবস্থান তা পশ্চিমবাংলাতে আরো জটিলতর রূপ ধারণ করে। এর থেকে

প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে তৎকালিন মেহেরপুর বর্তমান তেহট্ট মহকুমা। ব্রিটিশ নীলকর সাহেবরা নদী বহুল এ অঞ্চলে পরিবহণের ও নীলচাষের উপযোগীতার কারণে বসবাস করলেও পাশ্চাত্য প্রভাব তেমন ভাবে এই অঞ্চলে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। এই অঞ্চলের বাসীন্দার অধিকাংশ ছিল আধিবাসী নিম্নবিত্ত, মুসলমান সম্প্রদায়। অধিবাসীদের মধ্যে কিছু অঞ্চলে নারীরা কৃষিকার্যের সাথে যুক্ত থাকলে শিক্ষা সংস্কৃতির স্বাধীনতা বা আর্থিক স্বচ্ছন্দতা লাভ করে নি। প্রভূত পরিমাণে মুসলমান সম্প্রদায় বসবাস করায় এই অঞ্চল ধর্মীয় বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক দিক দিয়ে নারীকে একরূপ গৃহবন্দি করে ফেলে।

নারীদের স্বাধীনতা দেবার চেষ্টা করে আমাদের দেশের বিভিন্ন মনিষীগণ। যারা তৎকালিন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন তারা সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ, বাল্য বিবাহের মত বর্বর প্রথা রোধ করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ততদিনে সামাজিক বেড়াজাল ও অশিক্ষা অন্ধবিশ্বাস এমন ভাবে বেঁধে ফেলে যে তারা নতুন স্বাধীনতা কে ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সতীদাহ রধ হলেও বিক্ষিপ্ত ভাবে তা থেকেই যায়। বাল্যবিবাহ রধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন আজও সমাজে সঠিক মাত্রায় গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করেনি। বিশেষত তেহট্ট অঞ্চলে বাল্যবিবাহের মত প্রথা আজও যথেচ্ছ রয়েছে। স্বাধীনতার এতো বৎসর পরে নারীর স্বাধীনতা এই অঞ্চলে সঠিক মাত্রায় গ্রহণীয় হয়ে ওঠে নি।

বিদ্যাসাগর, রামমোহন, প্রমূখ মনীষীদিগের হাত ধরে যে নারী শিক্ষা প্রসার ঘটেছিল তা বিক্ষিপ্তভাবে সফল হলেও সঠিক ভাবে বিস্তার লাভ করে নি। আজ তেহট্ট অঞ্চলে একদা নবদ্বীপের শিক্ষার সংস্কৃতির প্রভাব থাকলেও নারীর প্রতি অনীহা এ অঞ্চলে তেমন যোগ্য স্থান দেয় নি তাদেরকে। ইংরেজ আমলে এই অঞ্চলে নীলচাষের কারণে শোষিত মানুষ বিশ্বের তীব্র অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে যায় তার সঙ্গে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার কারণে দেশের যে দোলাচলতার প্রভাব পড়ে তেহট্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোর উপর। ১৯৫০ সালে অন্যদিকে ভারত বাংলাদেশ বিভাগ ১৯৭১, ১৯৪৭ স্বাধীনত ভারতের ১৯৭৬ মন্বন্তর বিভিন্ন কারণে তেহট্ট মহকুমার মানুষ বাঁচার জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে থাকে। এই অঞ্চলে প্রধানত কৃষিপ্রধান হওয়ায় এদেশি ও আগত বাংলাদেশ ও পাকিস্থানের মানুষকে সামাল দেওয়া ও তাদের কর্ম প্রদান করা সম্ভব পর হয় না। ফলে পুরুষের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে যাদের আর্থিক ব্যবস্থা তৎকালে ভালো ছিল তারা ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হল অন্যরা কলকারখানার কাজে নিযুক্ত হতে গ্রাম ছাড়লো। ফলে নারীর সম্মুখে পরিবারের মুখে অন্ন যোগানের ভার এসে পড়ল। তাই কিছু নারী কর্মের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু এই অঞ্চলের অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত মেয়েদের কোন ভালো কাজের সন্ধান হল না ফলে, পরিচারিকা মাঠের কাজে যোগদান করতে থাকলো এরা।

সাধারণত শহর ও শহর তলির মেয়ের কাছে অল্পকালের মধ্যে পয়সার প্রলোভন তাদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করে। পরোক্ষ ভাবে পুরুষের শৃঙ্খল ও শোষণ তাদের বিশৃঙ্খল জীবন যাপনে বাধ্য করে তবে সমাজ মেনেও নিয়েছে তা অর্থনৈতিক কারণেই হোক বা অন্য কারণে। তবে কিছু রক্ষণশীল পরিবারেরা কাছে ও গ্রাম্য মানুষের কাছে এই ধরণের কাজ আজও বর্জিত। তবে তেহট্ট অঞ্চলে কলকাতা থেকে দূরবর্তী হওয়ার ব্যপকতর যৌনবৃত্তির যে ধারা লক্ষিত হয় তা এখানে সে ভাবে নেই। এখানকার নারী বা মূলত আজ অনেকটাই পিছিয়ে। তারা মূলত গৃহকাজ, কৃষিকাজ, পরিচারিকা বৃত্তি

ইত্যাদিতেই নিভৃত থাকছে।

আজ স্বাধীনতার এতো বছর পরে নদীয়ার তেহট্ট মহকুমার মেয়েরা শিক্ষার আওতায় এসে অনেকটাই বিকশিত করেছে তাদেরকে। শিক্ষকতা, ডাক্তারি, উকালতি ইত্যাদি জীবিকার পাশাপাশি এই অঞ্চলের মেয়ের আজ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে কাজে যোগগান করেছে। কোম্পানীর কাজেও নিযুক্ত হয়ে চলেছে যথেষ্ট ভাবে। যেহেতু শিক্ষা এই সমস্ত কাজে অন্যতম প্রধান অবলম্বণ তাই যারা কম শিক্ষিত যারা এই সমস্ত কাজের জন্য যোগ্য নয় তারাও আজ পিছিয়ে নেই। যেমন পার্লার বিভিন্ন দোকান বা প্রতিষ্ঠানে সেলসগার্ল, রিসেপসনিষ্ট, ব্লাউজ মিউজিয়াম, সেলাই কেন্দ্রিক দোকান যেমন চুড়িদার তৈরী ইত্যাদির কাজ করে আর্থিক ভাবে তহট্ট অঞ্চলের মেয়েরা স্বামীর পাশে এসে দাড়িয়ে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করছে। এই অঞ্চলে যেহেতু পান ও পাটকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক দিক রয়েছে তাই নারী এসময় পাট ও পানের বরজে কাজ করে ও আর্থিক ভাবে স্বাধীনতা কামনা করে চলেছে। তবে এখানের নারীদের মধ্যে মূল্য বোধ, সমাজবদ্ধতা অনেকটাই বেশী। আর্থিক ভাবে স্বামীর উপর নির্ভর না হলেও স্বামী সংসারের রাধন মেনে নিয়ে চলতে এরা বেশী অভ্যস্থ। তবে বিবাহবিচ্ছেদ করে Single Mother হিসাবে জীবন যাপন একেবারেই নেই তা নয়। তবে এর হার কম। তবে এমন নারীও রয়েছে যারা আজও আর্থিক ভাবে পুরুষের প্রতি নির্ভরশীল তবে গৃহের রাশ তারই হাতে। আর্থিক বাদে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা সে ভোগ করে নির্বিকারে।

এতো গেল বিবাহিত মেয়েদের কথা। তেহট্ট করিমপুর বেতাই, নাজিরপুর, শিকারপুর প্রভৃতি অঞ্চলে অবিবাহিত মেয়েরা আজ আর গৃহের অভ্যন্তরে বন্দি নয়। শিক্ষা গ্রহণের কারণে কারা আজ ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে চলেছে। নাচ, গান, খেলাধুলা সংস্কৃতি জগতে আজ তাদের অবাধ বিচরণ। প্রথমত কলকাতায় মেয়েরা যে ধরণের স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এই অঞ্চলের মেয়েরাও তেমনি সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। শিক্ষার জগতে থেকে আজ তার বিশ্বায়ণের সকল সুবিধা উপভোগ করতে পারে। আজ তেহট্ট মহকুমার নারীরা অনেকটাই এগিয়ে গিয়ে আজ এই অঞ্চলের প্রতিটি ঘরে ঘরে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে চলেছে যে অশিক্ষা একদিন নারীর জীবনের অভিশাপ ছিল তা আজ সরে গিয়ে আশার আলো প্রস্ফুটিত হয়েছে। এর শিক্ষার অগ্রগতি পাশে অবশ্য অন্ধকার ও রয়েছে। এই অঞ্চলের এমন অনেক গ্রাম আজও আছে যেখানে অশিক্ষা দানা বেধে রয়েছে। আজ বাল্যবিবাহ চলে অবাধে অবাধে চলে নারী নির্যাতন চলে পণপ্রথার মত জঘন্য অপরাধ। এর জন্য প্রধানত দায়ী অশিক্ষা। আজও ডাইনী অপরাধে হত্যা করা হয় মেয়েদের। আজও যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু হয় প্রসূতি মায়ের। সহ্য করতে হয় পুরুষের অত্যাচারকে। এছাড়া তেহট্ট মহকুমার প্রধানত নমশুদ্র ও মুসলমান অধ্যুষিৎ যে সমস্ত অঞ্চল রয়েছে সেখানে সচেতনতার অভাব অনেক বেশী। প্রথানত মুসলমান শরীয়তের দোহায় দিয়ে নারীকে অনেক ধরণের বিনোদন মূলক কাজ থেকে বিরত করেছে যেমন নাচ, গান, সাজসজ্জা এমন কি দূরদর্শন দেখা থেকেও যেখান থেকে মানুষ কিছু শিক্ষতে পারে।

তবে নারীকে তার ভাগ্য জয়ের অধিকারের দাবীতে কেন্দ্রিয় সরকার। বেটি বাঁচাও প্রকল্প, রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প ও আরো নানা ধরণের মানোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করে চলেছে। চাকুরী ক্ষেত্রে সংরক্ষণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে সংরক্ষণ,

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রভৃতি কারণে নারী আজ আর উপেক্ষিতা নয়। রাজনীতিতে নারী অধিকার তাকে অনেকটাই স্বাবলম্বী করে তুলেছে এই ধরণের পরিকল্পনা থেকে তেহট্ট মহকুমাও বঞ্চিত নয় সরকারের সহযোগীতা অঙ্গনয়াড়ি, সর্বশিক্ষা ইত্যাদি তে মহিলাদের নিয়োগ, আশাও অনেক ধরণের গ্রুপ যা নারীকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসে কর্ম উদ্যোগ দান করেছে। ফলে নারী আজ মুক্ত বিহঙ্গে পরিণত হয়েছে। গৃহকাজ, সন্তান পালন ও পুরুষের তোষামদ নয় আজ তারা সামাজিক স্বাধীনতার মুক্ত স্বাদ গ্রহণ করেছে।

তাই বলা চলে সামাজিক পরিবর্তন, শিক্ষার প্রসার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক জগতে সংযুক্তি, বিভিন্ন সরকারী পরিকল্পনা, স্বনির্ভর গোষ্ঠি ও মহিলা সমিতির সহযোগীতা সংস্কৃতিক জগতে যোগদান, বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগদান, ব্যাঙ্কিং সুবিধা গ্রহণ করে নিজস্ব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ সর্ব ক্ষেত্রে আজ তেহট্ট মহকুমার নারীর অগ্রগামী। কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকলেও সেগুলো তাদেরকে আর অবদমিত করতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে আজ তারা মুখর, বিশ্বের দরবারে আজ তারা গৃহে মাতৃত্বে মমতাময়ী, কর্মক্ষেত্রে দক্ষ কর্মী আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজ অসুরদলনী রূপে প্রতীমান। গৃহে থেকে সকল কর্ম সম্প্রদান করে ও কর্মক্ষেত্রে তার সমান ভাবে স্বাবলীল। শুধু সংসার নয় আজ রমনীর গুণে জগত হয়ে উঠেছে সুখের।

নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভাষার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক ঃ

তেহট্ট মহকুমার নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভাষার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের আলোচ্য বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করবে নদীয়ার ভাষা প্রসঙ্গ। নদীয়ার ভাষা বলতে আমরা নবদ্বীপের সংস্কৃত চর্চাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এর সাথে মিশে ছিল আরবী, পারসী, উর্দু ভাষা। কারণ তৎকালীন রাজ কর্মচারীরা লেখার ক্ষেত্রে এই ভাষাগুলিকে প্রাধান্য দিত। পরিশুদ্ধ বাংলা ভাষা সেখানে শেখার ক্ষেত্রে গ্রহণ যোগ্যতা লাভ করে নি। তবে বলা যায় মূখ্য জনপদগুলিতে যে ভাষা ব্যবহার হত তার থেকে অনেক আলাদা সীমান্ত বর্তী প্রত্যন্ত গ্রামগুলি। মূলত রাঢী উপভাষা এই অঞ্চলের ভাষা বৈশিষ্ট্য। তবে ভালো ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায় এদের কথ্য ভাষা সম্পূর্ণ আলাদা।

এই কথ্য ভাষার আলাদা হওয়ার মূল কারণ স্বাধীনতাকালে (১৯৫০) সালে বাংলাদেশ থেকে আগন্তু মানুষ। তারা করিমপুর, তেহট্ট, বেতাই শিকারপুর ইত্যাদি সীমান্তবর্ত্তী গ্রাম গুলিতে বসবাস করতে থাকে। এদের কথ্য ভাষা ছিল বাঙালী। কিন্তু রাঢী ভাষা প্রধান অঞ্চলে বসবাস ও মেলামেশার কারণে রাঢী ও বঙ্গালী মিশে এক মিশ্র ভাষা তৈরী হল। এছাড়া আরো একটি ইসলামিক ভাষার প্রচলন এই অঞ্চলে হয় কারণ এখানের অঞ্চল গুলি মুসলমান অধ্যুষিত।

লক্ষ করলে দেখা যায় এই অঞ্চলের ভাষার ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, গঠন নদীয়ার অন্যান্য অঞ্চলের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এতে লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বিস্তর। এই ভাষা আবার নারী পুরুষ ভেদে আলাদা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে। পুরুষেরা তাদের জীবিকার কারণে, বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে, বাইরের জগতে মেলামেশার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি শিক্ষা তাদের ভাষাকে পরিশিলীত করেছে তাই তাদের ভাষা অনেকাংশেই মান্য

রূপান্তরিত হয়েছে। তবে নারীরা বিভাগ মুক্ত হতে হতে পারেনি তাদের আজ সামাজিক পরিকাঠামো ও শিক্ষার কারণে।

প্রথমেই আলোচনা করেছে ড্রীপ স্ট্রাকচার সুপার স্ট্রাকচারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নদীয়ার তেহট্ট মহকুমার মেয়েদের নানা কারণে যেমন সামাজিক, আর্থিক, ও শিক্ষার সময়ের সাথে সাথে অবস্থান্তর ঘটেছে। সামাজিক স্তর বিন্যাস, ধর্মীয় কারণ, ইত্যাদির জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের সামাজিক ও শিক্ষার দিক দিয়ে একই ভাবে পরিবর্তন সাধিত হয় নি। ফলত নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র লক্ষিত হয়েছে। যেমন সাধারণ স্তর অধিবাসী সম্প্রদায়, ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নারী, শিক্ষিত নারীরা তাদের ভাষাকে অনেকটাই পরিশীলিত করেছে। স্কুল কলেজে শিক্ষা লাভের কারণে ইংরেজী, হিন্দী, আরবী তৎসম ইত্যাদি শব্দ তাদের ভাষার অনায়াসে গ্রহণ করেছে। নারীরা তাদের ভাষার যে সহজাত বৈশিষ্ট গুলি ব্যবহার করে তা থেকে বেরিয়ে এসে মান্য চলিতের ব্যবহার করে চলে, মহিলারা অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজে শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মকরার সুবাদে এই তাদের ভাষাকে মার্জিত করে তুলেছে।

তবে ভাষার এই মার্জিত রূপ অশিক্ষিত নারীদের ক্ষেত্রে তেমন ভাবে প্রচারিত নয়। তারা রাঢী ও বঙ্গালী মিশ্রিত ভাষায় অভ্যস্ত। মেয়েলি ভাষার সহজাত ধরণ তাদের ভাষায় প্রকাশিত। টেলিভিশন, রেডিও ও কিছু সামাজিক স্তরের উন্নতি ঘটায় এদের ভাষাও বর্তমানে অনেকটাই বাইরের জগতের উপযুক্ততা মান্য করে চলেছে তবে ক্ষেত্রে বিশেষে শিক্ষার গভীরতা না থাকায় ভাষার পরিমার্জিত রূপ বিকৃত হয়ে পড়ে। তবে আধুনিকতা, ইংরেজী ও হিন্দী শব্দের ব্যবহার এই ধরণের মেয়েদের মধ্যে আজ প্রভূত লক্ষিত হয়। বৃহত্তর জগতের সাথে পুরুষের পাশাপাশি এই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মহিলারাও ভাষার ব্যবহারে মান্য চলিত কেই ব্যবহার করে বলে।

বলাবাহুল্য সাক্ষরতা অভিযান, নারী শিক্ষা, কন্যাশ্রী, বেটি বাচাও ইত্যাদি সরকারী প্রকল্প গুলির দৌলতে শিক্ষার বিস্তার ঘটায় নদীয়া ও তৎসংলগ্ন তেহট্ট মহকুমার নারী ভাষা শিষ্ট চলিত ভাষায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। এছাড়া এই অঞ্চলের নারীরা শিক্ষার কারণে শহরাভিমুখী হয়ে ভাষাকে করেছে পরিশীলিত। তাই বলা চলে ক্রমশ নারী শিক্ষার প্রভাব তেহট্ট মহকুমার বিভাষা কে মান্য চলিত খুব দ্রুততায় রূপান্তরিত করবে যার মুখ্য স্থানে রয়েছে নারী।

তথ্যসূত্র ঃ

১। পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া জেলা সংখ্যা, ইতিহাসের রূপরেখায় নদীয়া ও নদীয়ার পুরাকীর্তি, মোহিত রায়, পৃ-৪৩

২। ওই, পৃ-৪৪

৩। নদীয়ার ইতিহাস, সংগ্রহ ও সম্পাদনা কমল চৌধুরী (প্রথম পর্ব) পৃ-৫৭

৪। নদীয়ার কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক, পৃ-৫

৫। পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া জেলা সংখ্যা, ইতিহাসের রূপরেখায় নদীয়া ও নদীয়ার পুরাকীর্তি, মোহিত রায়, পৃ-৪৪

৬। ওই, পৃ-২৯৬

৭। ওই, পৃ-২৯৭

৮। ওই, পৃ-২১৭

৯। ওই, পৃ-৪৬

১০। ওই, পৃ-৩১৮

১১। ওই, পৃ-১৬

১২। ওই, পৃ-১১৫

১৩। ওই, পৃ-১১৮

১৪। ওই, পৃ-৩৩০

১৫। ওই, পৃ-২২৭

★ প্রকাশক ও প্রকাশকাল প্রভৃতি গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত হয়েছে ★